আনন্দমেলা

২৯ অগস্ট ১৯৭৯

১

আনন্দবাজার-প্রকাশন

কোয়ালিটি কন্ট্রোল এক্সপার্ট
মস্ত ইনি গুণী
বাটার কাছে বিশেষজ্ঞ
মায়ের চোখের মণি
ওর বয়স এখন ৭ থেকে ১২ আর লম্বায় ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি থেকে ৪ ফুট।
স্বভাব অতি দুরন্ত—পা যেন বাড়িয়েই আছে।
সর্বদাই ছুটে বা লাফিয়ে চলে—হাঁটা একেবারেই আসে না।
আর সামনে যা কিছু পাবে, তাতেই পা চালানোর অভ্যাস।
দুরন্তপনার সব চোটটাই গিয়ে পরে এদের জুতোর উপর।
সত্যি বলতে কী, এদের পায়ে ঠিক কোন ধরনের জুতো মানানসই হবে সে শিক্ষা বাটা এদের কাছ থেকেই পেয়েছে।
এদের অবদানের কথা মনে রেখেই আমরা এই ধরনের জুতোগুলির নাম রেখেছি 'টাফি'।
আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে, বাটা ভারত ও বিশ্বের সব দামাল ছেলেদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে
Bata
শুধু সেরা জুতোই নয়,
আরো অনেক বেশী

আনন্দমেলা

১২ ভাদ্র ১৩৮৬ • ২৯ অগস্ট ১৯৭৯ • ৫ বর্ষ • ৭ সংখ্যা

ছড়া
মামার-বাড়ি যাওয়া। অন্নদাশঙ্কর রায় ৭
পড়ার সময়। শ্যামল পুরকায়স্থ ১৮
পিন্ডি। রবিদাস সাহারায় ৩০

গল্প
বাজারদর। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৮
বুকুনমামার ডিমভাজা। নারায়ণ চক্রবর্তী ৩২
রাত্রির যাত্রী। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৪১
পরীরা এখনও আছে। সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬

উপন্যাস
কে। বিমল মিত্র ১৩
পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৭

শিশু গল্প
মাসাইমারার সেই সিংহী। জয়ন্ত সরকার ৪

ছোটদের
খেলতে-খেলতে। চুনী গোস্বামী ৩৬

ছবিতে
সদাশিব ১৯, রোডার্সের রয় ২০, টিনটিন ২২
বিশ্বকাপ ২৪, টারজান ২৬, বাঘা ৪৬, গাবলু ৪৭

খেলাধুলো
ডাম্বার খেলা। কুন্তক ৪৮
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৪৯
মাধ্যমিকে ফার্স্ট অভির কথা ৬২

খেলাধুলো
দারুণ খেলছেন সাব্বির। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৫১
দুর্দান্ত শ্যাম। অশোক দাশগুপ্ত ৫৩
ফার্স্ট বোলার চাই। অলোক দাশগুপ্ত ৫৪

অন্যান্য আকর্ষণ
ছবির মজা ১৮, নদনদী ২৫, হযবরল'র দেশে ৩১
ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, তোমাদের পাতা ৬৪,
আঁকো-শেখো ৬৬

প্রচ্ছদ বিমল দাস

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

খোলা চিঠি

প্রিয় বন্ধুরা,

যে শহরে আমরা থাকি তার ভালমন্দর খবর সব সময়ই আমরা বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়ি। কিন্তু শহরটার সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি না। তবে মাঝে মাঝে একটা নাম পাই, সেটা হচ্ছে সি, এম, ডি, এ বা ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। "জেনারেল নলেজ" হিসাবেই সি এম ডি এ আসলে কি কি কাজ করে সেই সব নিয়েই কিছু বলতে চাই।

ধর স্কুলে যাবার সময় যে দু'চার বালতি জলে তোমরা স্নান কর, কিংবা এইমাত্র যে জলটা খেয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখলে, এ-সবের পিছনেই সি এম ডি এ-র অবদান রয়েছে। অর্থাৎ মহানগরীতে জলের সরবরাহ বাড়ানো।

জান বোধ হয় যে, কলকাতা মহানগরীটা ১৪·২৫ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে, আর সেই ছড়ানো এলাকায় বাস করেন ৮৩ লক্ষ লোক।

তাদের জন্য খাবার জল, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, ফ্লাইওভার তৈরী আবার কোলকাতার জল জমা কমানোর জন্য নালা নর্দমা খোঁড়া, পরিষ্কার করার চেষ্টাও এরই কাজ।

তোমরা নিশ্চই বলতে পার যে, 'জল তো জমছেই" সেইজন্য বলেছি যে, 'জল জমা কমানোর চেষ্টা' হচ্ছে। যদি এর পরও কিছু বলতে বা জানতে চাও, তাহলে "ওয়েলকাম"।

জানি তোমরা রাগ করে বলবে যে শহরটায় নড়াচড়া পর্যন্ত দায়, তাকে নিয়ে আবার লেখালেখি? কিন্তু শহরটাতো তোমাদেরই।

তেমনিভাবে নতুন তিনটে উপনগরী তৈরী হচ্ছে, তার কথাও তোমাদের জানা উচিত।

সি, এম, ডি, এ-র আরও অনেক কাজ আছে—যেমন বস্তীগুলির মধ্যে কিছু কিছু উন্নতি মফঃস্বল এলাকায় রাস্তাঘাট তৈরী, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ, প্রাথমিক স্কুল স্থাপন —এমন কি, কলকাতা থেকে গরু সরিয়ে নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়া।

সব কিছু যদি জানতে চাও তাহলে চিঠি লেখো নীচের ঠিকানায়—জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ ৩-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৭।

মাসাইমারার সেই সিংহী

জয়ন্ত সরকার

গাড়িটা যদি আর ছ-সাত ফুট সোজা পিছু হটত, তা হলে যে কী হত, তা জানে মাসাইমারার সেই সিংহী, আর ভগবান। কিন্তু কপাল ভাল—লিমো নিজে থেকেই গাড়িটা হঠাৎ বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিল। আর যখন থামল তখন দেখলাম সিংহী খুবই বিরক্ত, সামনের পা দুটো মাটিতে ঘষছে। ভাবটা যেন—দেখবি নাকি একবার।

ব্যাপারটা হয়েছিল এইরকম। কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি থেকে সকাল ১১টা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লুম নতুন ঝকঝকে একটা জাপানি গাড়িতে। যাব নারোক হয়ে আফ্রিকার বিখ্যাত জঙ্গল মাসাইমারা এলাকায় কিকোরক লজ-এ। সেখানেই রাত কাটাবার কথা।

গাড়ি ছুটল ঘন্টায় ১০০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার বেগে। নারোক পর্যন্ত রাস্তা পাহাড়ে ধরনের উঁচুনিচু। তারপর গাড়ি ঘুরল মাসাই অঞ্চলের দিকে। কিছু দূর যেতে না-যেতেই আমাদের ড্রাইভার লিমো বলল, 'জিরাফ'। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখলুম দুটো লম্বা লম্বা জিরাফ বেশ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা গাছের ফল খাচ্ছে। এই আমাদের প্রথম 'জন্তু-দর্শন'।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। লিমো যেমন পাকা ড্রাইভার, তেমনি পাকা গাইড। কোথায় কোন্ ঝোপঝাড়ের পাশে একটা হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক তার চোখে পড়বে। বয়স বেশি নয়—তিরিশের কাছাকাছি। শক্ত চেহারা। এই কাজ করছে বেশ কয়েক বছর। মাসে চার-পাঁচ বার এই রাস্তায় যাতায়াত করে, কোনো কোনো সময় তার চেয়েও বেশি। ইংরেজি, সোহেলি আর তার নিজের লাউ উপজাতির ভাষা বলতে পারে।

গাড়ি এগিয়ে চলছে। এদিকে-ওদিকে ছোট ছোট পাহাড় চোখে পড়ছে। বড় গাছ খুব একটা দেখা যায় না। কোথাও ঘাস ছোট, কোথাও বড়—তিন-চার ফুট। আর এই লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতরেই সিংহপরিবারের বাবা-মা-ছেলেমেয়েরা মৌজ করে বসে থাকে। আর নজর রাখে, আর-সব জন্তু-জানোয়াররা কে কী করছে।

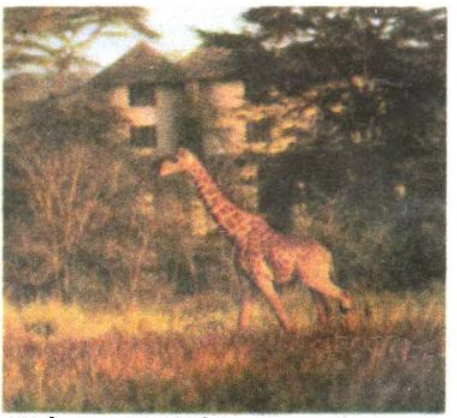

অরণ্য-নিবাসের সামনেই জিরাফ

বেশ কিছু দূর যাবার পর পাকা রাস্তা শেষ। আমরা ঢুকলাম মাসাইমারা সুরক্ষিত জঙ্গল এলাকার মধ্যে। এখান থেকে পেটা মাটির সড়ক। পাকা পিচের রাস্তা বন্য জন্তুরা ভালবাসে না তাই এই বন্দোবস্ত। লোকজন প্রায় চোখেই পড়ে না। মাইলের পর মাইল যাবার পরে দেখা যায় একজন বা দুজন মাসাই আদিবাসী রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। মাঝে মাঝে এক পাল গোরু আর কয়েকজন ছোট ছোট রাখাল ছেলে চোখে পড়ে। গাড়ি দেখে হাত নাড়ে তারা।

বিচিত্র এদের সাজপোশাক। পুরুষেরা মোটা গামছার মতন রঙচঙে একটা কাপড় পরে থাকে। কারুর হাতে বর্শা, কারুর হাতে তীর-ধনুক। লিমো বলল, ওগুলোতে বিষ আছে, আর এই দিয়েই ওরা শিকার করে। অনেকেরই দেখলাম কানের লতিতে অ্যায়সা বড় একটা ফুটো। আর কান থেকে ঝুলছে আট থেকে

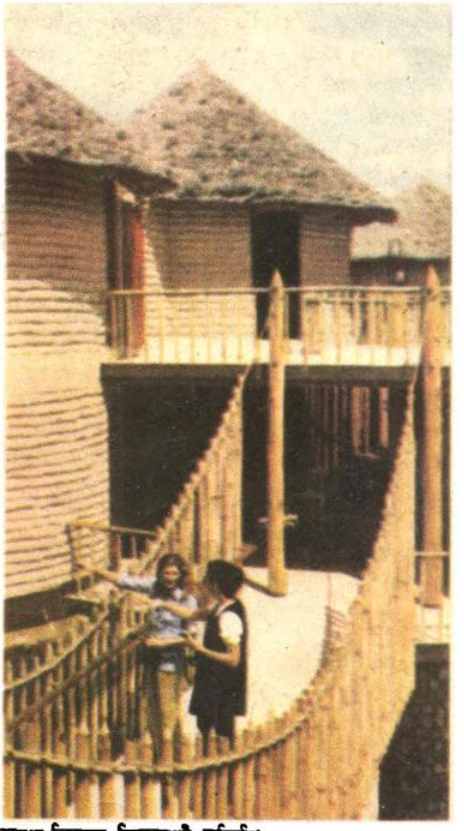

অরণ্য-নিবাসে বিদেশী অতিথি

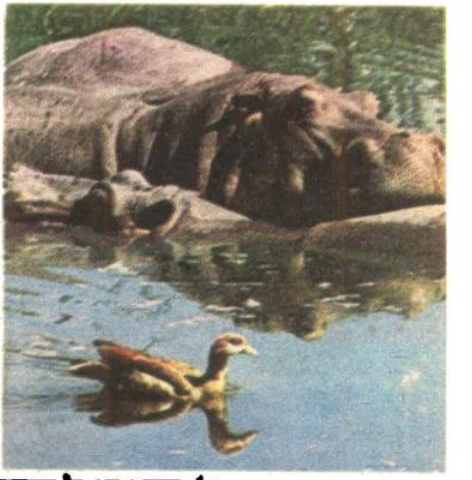

জলহস্তীর পাশে বুনোহাঁস

দশ ইঞ্চি লম্বা বিচিত্র সব উপকরণের দুল। মেয়েদের সাজেও কোনো বাহুল্য নেই। সকলেরই প্রায় মাথা ন্যাড়া—সেটা নাকি এক-রকমের সৌন্দর্যচর্চা। তারাও দুল পরে। গলায় পরে পুঁতির হার, আর শহুরে লোক দেখলে মাঝে মাঝে হাসে, মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে যায়। কেউ ছবি তুলছে দেখলে বলে, 'শিলিং শিলিং।' (শিলিং হল কেনিয়ার টাকা।) এরা চাষবাস করে না। এদের বিশ্বাস, মাটি খোঁড়া অশুভ। একমাত্র কবর দেওয়ার সময়ই এরা মাটি খোঁড়ে।

লিমোর গাড়ি ছুটে চলেছে তীব্র গতিতে। অনেক দূরে রাস্তার উপরে এক জায়গায় দেখতে পেলুম হলদে হলদে তিন-চারটে কী যেন পড়ে রয়েছে। লিমো বলল—সিংহী। কাছে আসতে দেখলুম সত্যিই তো। তিনটে সিংহী রাস্তায় গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, আর একটা রাস্তার পাশে বসে জিরোচ্ছে। গাড়ি আসতে দেখে অলসভাবে তারা উঠে দাঁড়াল। আমাদের দিকে তাকাল এবং কিছুটা বিরক্তভাবেই রাস্তা থেকে নেমে পাশে ঘাসের ভেতরে চলে গেল। কী রাজকীয় ভাব! ওখান থেকে প্রায় ৩০০ গজ দূরে, লিমো দেখাল, দুটো জেব্রা ঘুরে বেড়াচ্ছে। লিমো বলল, সিংহীগুলো ঐ জেব্রা-গুলোকে ধরার চেষ্টা করবে, যদি না জেব্রা-গুলো গন্ধ পেয়ে পালিয়ে যায়।

বেলা ৩টে নাগাদ আমরা কিকোরক লজে এসে পৌঁছলুম। সুন্দর ছিমছাম পরিবেশ। ছোট ছোট টালির বাড়ি। সেখানেই লোক থাকে। আর চার-পাঁচ দল এসেছে। লজের ভেতরেই ছোট একটা পুকুর করা হয়েছে। সেখানে রাত্তিরবেলা অনেক জন্তু-জানোয়ার জল খেতে আসে। বড় ফ্লাড লাইট জ্বলে। ঘরে কাচের জানলা আর লোহার গরাদ। তবে লজের লোকেরা বললেন যে, বেশি রাত্তিরে ঘরের বাইরে না বেরোনোই ভাল।

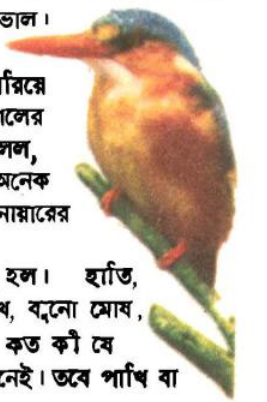

একটু চা-পানি খেয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লুম মাসাই জঙ্গলের উদ্দেশে। লিমো বলল, বিকেলবেলার দিকে অনেক সময় বেশি জন্তু-জানোয়ারের দেখা মেলে।

তার কথাই ঠিক হল। হাতি, হরিণ, টোপাই, উটপাখি, বুনো মোষ, জেব্রা, জিরাফ আরও কত কী যে দেখলাম তার হিসেব নেই। তবে পাখি বা

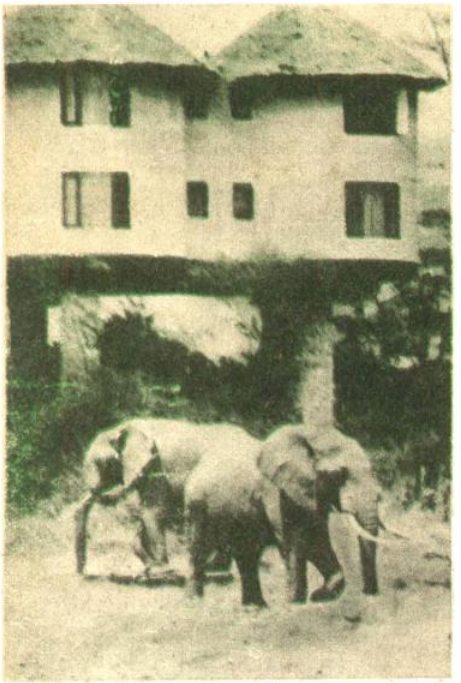

অরণ্য-নিবাসের সামনে জোড়া হাতি

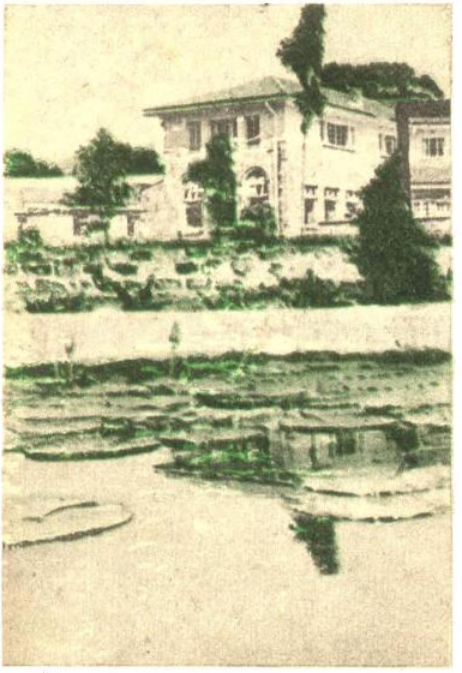

হোটেলের সামনে পদ্ম-পুকুর

সাপ কোনোটাই খুব চোখে পড়ল না। লিমো বলল সাপ নাকি বছরের এই সময় খুব একটা দেখা যায় না।

মেটে রাস্তা দিয়ে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। দু-একটা গাড়ি ফিরে আসছে। লিমো তাদের চালকদের সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে কথা বলছে। আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে খালি শুনলাম 'সিম্বা'। সিম্বা মানে সিংহ। এইরকম একজন চালকের সঙ্গে কথা বলে লিমো আমাদের বলল, শুনছি সামনে নাকি এক দঙ্গল সিংহ দেখা গেছে। গাড়ি চলল। বেশ কিছু দূর যাবার পর আরও চার-পাঁচটা গাড়ি দেখা গেল। সব কটিই রাস্তা থেকে নেমে ঘাসের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে। লিমোর গাড়িও রাস্তা থেকে নেমে পড়ল, একটু এগোতেই দেখলাম, সত্যিই তো সিংহী-পরিবার।

একটা ছ ফুট মাটির ঢিবির উপরে তিনটে সিংহী বসে আছে হাত তিরিশ দূরে। তাদের গা ঘেঁষে চারটে বাচ্চা। একটা বাচ্চা মাটিতে

নাইবাসা হ্রদের পাশে হোটেল

ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার যেন বসার জায়গা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। লিমো গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, একটু ওদিকে গেলে বোধহয় ভাল দেখতে পাব। সে গাড়ি ব্যাক করল। আমরা সবাই তখন ঐ সিংহীদের নিয়ে এত উত্তেজিত যে, কেউই আর দেখিনি পেছনে আরেকটা সিংহী বসে আছে ঘাসের মধ্যে। তাকে ভাল করে দেখাও যাচ্ছিল না। আমাদের গাড়ি যদি সোজা যেত তাহলে একেবারে তার ঘাড়ের উপরে গিয়ে পড়ত। ওরা এমনিতে কিছু করে না। কিন্তু যদি একবার ওদের ধারণা হয় যে, কেউ ওদের আক্রমণ করছে বা ওদের বাচ্চাদের ক্ষতি করতে চাইছে, তাহলেই ওরা ভীষণভাবে হিংস্র হয়ে ওঠে। যা হোক, সেবারের মতন আমরা সেই মারাত্মক অভিজ্ঞতা থেকে খুব জোর বেঁচে গেলুম।

সূর্য ততক্ষণে অস্ত গেছে। আকাশে রঙের ছটা। এবার ঘরে ফেরার পালা। কওহারি, সিম্বা, কওহারি। বিদায় সিংহ, বিদায়।

মামার-বাড়ি যাওয়া

অন্নদাশঙ্কর রায়

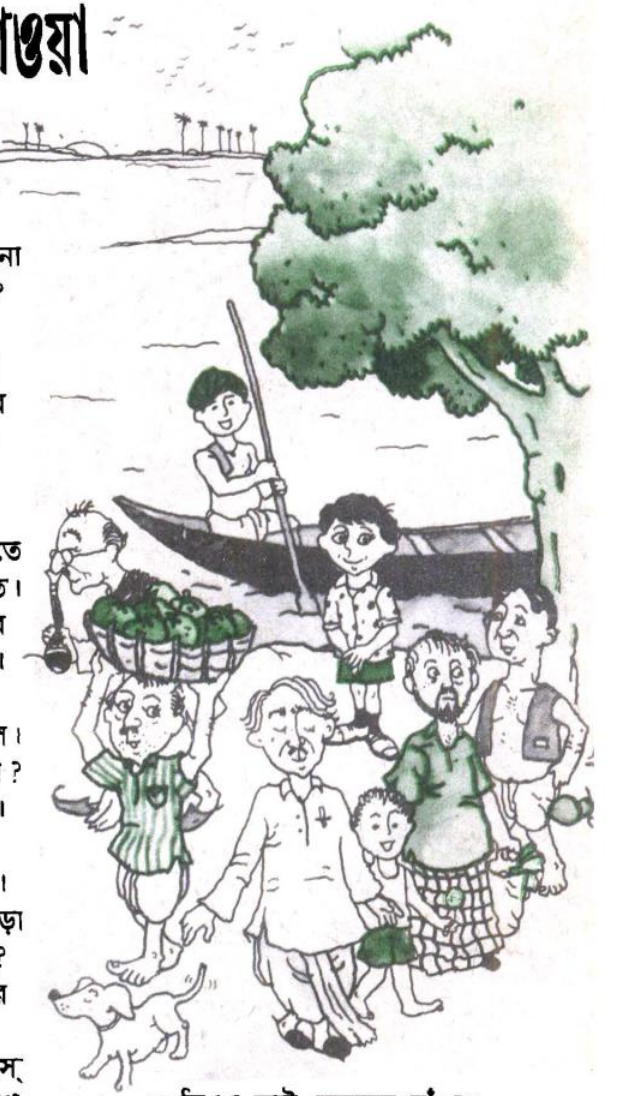

গোরা কবর ! ফাঁসি-দিয়া বর !
চহটার ঘাট ! কটক নগর !
'বর' মানে বট, সেই গাছে জানো
গতযুগে হত ফাঁসি লটকানো ?
গোরাদের ওই গোরস্থানেও
ভয় হানা দেয় কালার প্রাণেও।
পাশ দিয়ে যেতে খেয়া নৌকায়
বুক কাঁপে যদি আঁধার ঘনায়।
ভাবনা আমার লক্ষ্য আমার
সন্ধ্যার আগে মহানদী পার।
রাত কেটে যায় গোরুর গাড়িতে
বেলা বয়ে যায় নদী পাড়ি দিতে।
কী বিশাল নদী ! মাঝখানে চর
নাও থেকে নেমে হাঁটি বরাবর।
তরমুজ ছিল চরের ফসল
সেই তো জোগায় অন্ন ও জল।
চর কয় ক্রোশ ? পথ কি ফুরায় ?
ওপারের নায়ে চাপি পুনরায়।
ও মাঝি ভাই, জোরসে চালাও
বেলা পড়ে এল, চহটায় যাও।
আরে খোকাবাবু, কেন এত তাড়া
কম মেহনত লগি ঠেলে মারা ?
সুযি্য ডোবেনি, নদী হয়ে পার
পাটাতন ভেড়ে ঘাটে চহটার।
নাও থেকে নেমে সুখে দিই শিস্
মাঝি হাত পাতে—বাবু, বকশিশ?
সহযাত্রীরা পায়ে হেঁটে যায়
আমি পড়ে থাকি গাড়ির আশায়।
দেখতে দেখতে ঘনায় আঁধার
গা-ছমছম নদীর কিনার।
কাছেই কবর ফাঁসি-দিয়া বর
বেশ কিছু দূরে কটক শহর।
অবশেষে শুনি গাড়ির আওয়াজ
বুকের ভিতর বাজে পাখোয়াজ।
ও মিঞা ভাই, জোরসে হাঁকাও
পালিতপাড়ায় পৌঁছিয়ে দাও।
আরে খোকাবাবু, কেন এত তাড়া
ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া যাবে মারা।
গা-ছমছম গোরা কবর !
গা-ছমছম ফাঁসি-দিয়া বর !
দেখতে দেখতে পড়ে রয় পিছে
স্বপ্নের মতো হয়ে যায় মিছে।

ছবি দেবাশিস দেব

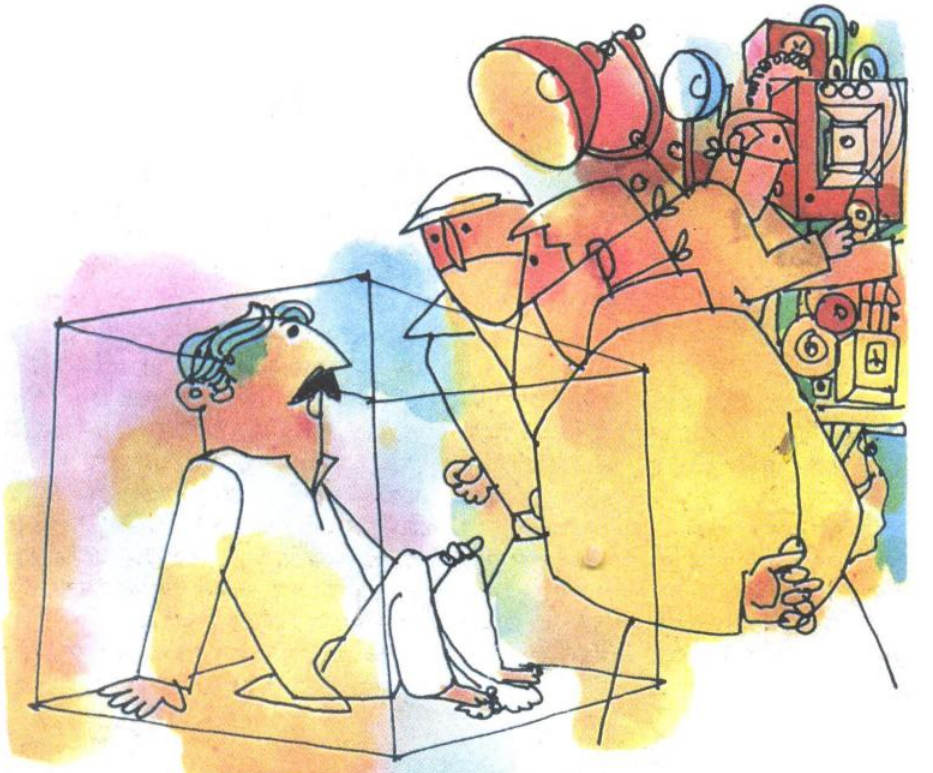

বাজারদর

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

একশো বছর পর ঘুম ভাঙতেই রামবাবু ভারী অস্বস্তি বোধ করলেন। যে কাচের বাক্সে তিনি শুয়ে আছেন, সেটার ভিতরটা ভীষণ ঠাণ্ডা। তার ওপর চোখে তিনি সবকিছু ধোঁয়াটে দেখছেন, কান দুটো ভোঁভোঁ করছে, হাত-পা খিল-ধরা, মাথাটা খুব ফাঁকা।

কিছুক্ষণ একেবারে ভোম্বলের মতো শুয়ে রইলেন রামবাবু। তারপর আস্তে আস্তে শরীর গরম হল, কানের ভোঁভোঁ কমে গেল, হাত পায়ের খিল ছাড়ল সবকিছু মনে পড়তে লাগল। মনে পড়তেই তিনি ভীষণ আঁতকে উঠে বসলেন এবং চারদিকে প্যাট-প্যাট করে তাকাতে লাগলেন। ১৯৭৯ সালে তাঁকে গভীরভাবে ঘুম পাড়িয়ে একটা ঠাণ্ডা বাক্সে ভরে মাটির নীচে একটা স্টোর রুমে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল ঠিক একশো বছর পর পরবর্তী সমাজের মানুষ তাঁর ঘুম ভাঙাবে।

একশো বছর কি কেটে গেল এর মধ্যেই? চোখের দৃষ্টি কিছু স্বচ্ছ হতেই তিনি দেখলেন, কাচের বাক্সটা একটা টেবিলের ওপর রাখা, টেবিলের চারধারে দাঁড়িয়ে সাদা পোশাক পরা কয়েকজন লোক তাঁকে গম্ভীরভাবে দেখছে।

রামবাবু প্রথমে একটা হাঁচি দিলেন, একটু কাসলেন, একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। ভারী লজ্জা-লজ্জা করছিল তাঁর। স্বাভাবিক নিয়মে এতদিন তাঁর বেঁচে থাকার কথা নয়। হিসেব করলে, এখন তাঁর বয়স ঠিক একশো চল্লিশ বছর। তাছাড়া এই একশো বছর পরেকার দুনিয়ায় কত কী পাল্টে গেছে। কেমন লাগবে কে জানে বাবা! তিনি প্রথমেই

দেখে নিলেন মানুষগুলোর এই একশো বছরের বিবর্তনে লেজ বা শিং গজিয়েছে কি না। গজায়নি। লোকগুলো খুব লম্বা বা বেঁটে হয়ে যায়নি তো? না। লোকগুলো ভাল, না খারাপ? বোঝা যাচ্ছে না। তবে সবচেয়ে বেশি যে-জিনিসটা তাঁর জানতে ইচ্ছে করছিল, সেটা হল বাজারদর। এখন চাল কত করে কিলো? আলু কত? মাছ কত? পালং, কপি, কড়াইশুঁটিই বা কীরকম?

রামবাবু একটু হেসে বললেন, "খুব একচোট ঘুম হল বাবা। টানা একশো বছর একেবারে!"

লোকগুলো তাঁর কথার জবাব দিল না। ভারী অভদ্র। এখনো খুব খরচোখে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। সকলের মুখেই কাপড়ের ঢাকনা।

রামবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "হাঁ করে দেখছ কী সবাই? গত একশো বছরে আমার পেটে কিছু পড়েনি তা জানো? দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটিনি। ছুটে গিয়ে খাবার-দাবার নিয়ে এসো। আর শোনো, চায়ের নাম শুনেছ তো? চা? জানো? হ্যাঁ, এক কাপ গরম চা দাও সবার আগে।"

লোকগুলো মৃদু-মৃদু হাসছে। রামবাবু ভাবলেন, এরা বোধহয় বাংলা ভাষা বোঝে না। তার আর দোষ কী? একশো বছরে ভাষারও কত পরিবর্তন হয়ে থাকবে। এখনকার বাংলা ভাষা হয়তো চীনেভাষার মতোই দুর্বোধ। তাই তিনি একটু চীনে ভাষার মিশেল দিয়ে বললেন, "খাবারচুং জলদিচি লাওং। গরমং চাং দরকারং।"

বলে নিজের ওপর একটু বিরক্তই হলেন রামবাবু। চীনে ভাষা তাঁর কস্মিনকালেও জানা নেই। অজানা ভাষার ভেজাল দিতে গিয়ে বাংলাটা কেমন সংস্কৃতঘেঁষা হয়ে গেল না?

লোকগুলো কিছু বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না। তবে অপারেশন থিয়েটারের মতো নানারকম যন্ত্রপাতিওলা ঘরটায় তারা হরেক কলকাঠি নাড়তে লাগল। রামবাবু হাই তুলে বললেন, "আর কতক্ষণ এই প্রায় দেড়শো বছরের বুড়োটাকে তোরা দন্ধে মারবি বাপু? খাবার না দিস একটা আয়না অন্তত দে। বুড়ো মুখটার কী ছিরি হয়েছে দেখি।"

লোকগুলো এ-কথাটা যেন কী করে বুঝতে পারল। একজন কোত্থেকে ছোট্ট গোল হাত-

আয়না বের করে ধরিয়ে দিল তাঁর হাতে। রামবাবু কী দৃশ্য দেখবেন সেই ভয়ে আয়নাটা মুখের সামনে ধরেও কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। চোখ খুলবেন কি খুলবেন না ঠিক করতে-না-করতেই অবাধ্য চোখদুটো বে-আক্কেলের মতো খুলে গেল। কিন্তু রামবাবু খুশিই হলেন। মুখের চামড়া একটু ঝুলে গেছে ঠিকই, দাড়িও একটু হয়েছে, তবে সব মিলিয়ে তাঁর চেহারায় বয়সের ছাপ তেমন পড়েনি। চল্লিশ বলেই চালানো যায়।

অবশ্য এরকমই কথা ছিল। কাচের বাক্সে যন্ত্রপাতি লাগিয়ে তাঁকে এমনভাবেই রাখা হয়েছিল যাতে তাঁর শরীরে অতি মৃদু হৃৎস্পন্দন হয়, অতি মৃদু গতিতে রক্ত চলাচল করে, অতি মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস চলে এবং শরীরের ক্ষয়ক্ষতি নগণ্য মাত্রায় ঘটে। এই একশো বছর আসলে তিনি ছিলেন মৃত। কাজেই শরীরটার বয়স বাড়েনি।

একটা লোক তাঁর বাঁ হাতটা বাগিয়ে ধরে ইনজেকশন দিচ্ছে। তিনি তাকে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন বাজারদরটা কীরকম বলতে পারো হে? আলু কত করে যাচ্ছে?"

লোকটা খুব অবাক হয়ে রামবাবুর দিকে তাকাল। রামবাবু ভাবলেন, লোকটা বোধহয় বাংলা জানে না। ইংরিজিতে বললেন, "পট্যাটো?"

লোকটা মাথা নাড়ে। রামবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন, "রাইস? ডোন্ট ইউ ইট রাইস?"

লোকটা মাথা নাড়ে। রামবাবু হাল ছেড়ে দেন। ইংরিজিও বিস্তর পাল্টে গেছে বোধ হয়। একটা ভারী অস্বস্তি হচ্ছে মনের মধ্যে। একশো বছর আগে অজ্ঞান হওয়ার সময় তাঁর বন্ধু বৈজ্ঞানিক গয়েশ হালদারের সঙ্গে একটা বাজি ধরেছিলেন। দুশ্চিন্তা সেই বাজিটা নিয়ে।

একশো বছর পর তাঁর ঘুম ভাঙলে লোকেরা তাঁর ওপর বিস্তর এক্সপেরিমেন্ট চালাবে, এরকম কথাই ছিল। লোকগুলো চালাচ্ছিলও তাই। ইনজেকশন দিল, রক্ত নিল, ব্লাডপ্রেশার দেখল, হাঁ করাল, শুইয়ে, বসিয়ে, চিত করিয়ে, উপুড় করে, বিস্তর পরীক্ষা চালাল।

রামবাবু আপনমনে বকবক করতে লাগলেন, "চল্লিশের মতো দেখতে বলেই কি আর চল্লিশের খোকা আছি রে বাবা? বয়সটা হিসেব করে দ্যাখ্ না! তারপর বুঝেসুঝে খোঁচাখুঁচি করিস।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! গোমড়ামুখো লোকগুলো নাগাড়ে তাদের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ রামবাবুর নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ পড়েনি কেন সেটাই আশ্চর্য! একশো বছর আগে অজ্ঞান হওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী বেঁচে ছিলেন, দুটো ছেলে আর চারটে মেয়ে ছিল, মাথার ওপর বুড়ো বাপ-মা, তিন ভাই আর সাত বোনও ছিল। এই একশো বছরে তাদের কারোই আর বেঁচে থাকার কথা নয়।

ভাবতেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন রামবাবু। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। একটা লোক তাড়াতাড়ি একটা টেস্ট টিউবে সেই চোখের জল ধরে রাখল।

তবে শোকটা খুব বেশিক্ষণ রইল না রামবাবুর। আত্মীয়স্বজনরা এতকাল বেঁচে থাকলে খুনখুনে বুড়োবুড়ি হয়ে যেত সব। সেটাও

ভাল দেখাত না। তিনি লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার বউ-বাচ্চারা এতকাল বেঁচে নেই জানি, কিন্তু নাতিপুতি বা তস্য পুত্রপৌত্রাদি কে আছে জানো? একটু খবর দেবে তাদের?"

একটা কিম্ভূত এক্স-রে মেশিনে তাঁকে ঝাঁঝরা করছিল লোকগুলো। পাত্তাও দিল না। তবে তারা চটপট যন্ত্রপাতি গুটোচ্ছিল। রামবাবুর মনে হল পরীক্ষা আপাতত শেষ হয়েছে। তিনি মটকা মেরে পড়ে রইলেন।

লোকগুলো কোনো সম্ভাষণ না জানিয়েই বেরিয়ে গেল। রামবাবু শুয়ে-শুয়ে চোখ পিট-পিট করতে লাগলেন। একশো বছরে বাইরের দুনিয়াটার কতটা পরিবর্তন হয়েছে, তা বুঝবার উপায় নেই এখান থেকে। এ-ঘরে নিরেট দেয়াল আর যন্ত্রপাতি। একটা পুরু দরজা আছে বটে, কিন্তু তার ওপাশে একটা করিডোর। বাইরে হয়তো এখন তুষার-যুগ চলছে, সূর্য হয়তো নিভু-নিভু হয়ে এসেছে, মানুষ হয়তো এখন বিজ্ঞানের বলে শূন্যে হাঁটে, জিনিসপত্রের দাম হয়তো একশো গুণ করে বেড়েছে। হয়তো.....!

রামবাবু শুয়ে-শুয়ে কিছুক্ষণ ঠ্যাং নাচালেন, তারপর 'দুত্তোর' বলে উঠে পড়লেন। ঘুরে ঘুরে ঘরের যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে লাগলেন। এক সময়ে তিনি নামকরা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তবু এই একশো বছর পরেকার আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলোর কলা-কৌশল তিনি ভাল বুঝতেই পারলেন না। একটা বোতাম টিপতেই ঝড়ের মতো শোঁ-শোঁ শব্দ ওঠায় তাড়াতাড়ি সরে এলেন সেখান থেকে এবং গিয়ে দরজার হাতল ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। ভাগ্য ভাল, দরজাটা হড়াক করে খুলে গেল।

কিন্তু করিডোরে পা রেখেই আঁতকে উঠলেন রামবাবু। করিডোরের মেঝেটা ঠিক নদীর ধীর স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে। তবে চলন্ত ফুটপাথ, এসকেলেটার বা কনভেয়ার বেল্ট রামবাবুর আমলেও ছিল, তাই খুব বেশি অবাক হলেন না। মাথাটা ঘুরছিল বলে তিনি চলন্ত করিডোরে বসে রইলেন। খানিকটা ওপরে উঠে এবং অনেকটা নীচে নেমে, খানিক ডাইনে গিয়ে এবং ফের কিছুটা বাঁয়ে মোড় নিয়ে করিডোর চলতে লাগল। একটু বাদে আর একটা দরজা পেলেন। করিডোর থেকে লাফ দিয়ে নেমে দরজাটা টানলেন রামবাবু। দরজাটা খুলেও গেল।

বাইরে বেরিয়ে এসে রামবাবু একটা গভীর শ্বাস ছাড়লেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, যা ভেবেছিলেন তাই। না, তুষার-যুগ আসেনি বা সূর্যও নিভু-নিভু হয়নি। বরং একটার বদলে আকাশের চারধারে চারটে এবং মাঝখানে একটা, মোট পাঁচটা সূর্য জ্বলজ্বল করছে। আবহাওয়া খুবই মনোরম। না গরম, না ঠাণ্ডা। চারদিকে একশো দুশোতলা বাড়ি একেবারে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে। আকাশেও তিনি বিস্তর বাড়িঘর ভেসে বেড়াতে দেখলেন। তারই ফাঁকে-ফাঁকে শোঁ করে নানান সাইজের রকেট উড়ে যাচ্ছে, পিরিচের মতো দেখতে কিছু জিনিসকেও উড়ে যেতে দেখলেন তিনি, আরও দেখলেন রকেট-লাগানো চেয়ারের মতো দেখতে ছোট ছোট আকাশ-গাড়িতে মানুষ চলা-ফেরা করছে।

সামনের চলমান ফুটপাথে উঠে পড়লেন রামবাবু। আশেপাশে আরও সব লোকজন রয়েছে। তারা হাঁ করে দেখছে তাঁকে। দেখবেই। তাঁর পরনে সেই একশো বছর আগে-কার ধুতি আর পাঞ্জাবি। এদের পরনে শুধু জাঙ্গিয়ার মতো খাটো একটু জিনিস, গা আদুড়।

রামবাবুর পাশেই একটা বুড়ো লোক। তার বয়স সত্তর বছর হবে। তা হোক, সত্তর হলেও এ-লোকটা রামবাবুর চেয়ে নাহোক সত্তর বছরের ছোট। তাই আপনি বলবেন না তুমি বলবেন, তা ঠিক করতে না পেরে রামবাবু বারকয়েক গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন ক'টা বাজে?"

বুড়ো লোকটা একটু অবাক হয়ে তাকাল বটে, তবে একটু খোনাসুরে বলল, "রাত ন'টা বেজে ছাত্রিশ মিনিট তেরো সেকেন্ড।"

রামবাবু নিজে বৈজ্ঞানিক। কাজেই অবাক হলেন না। এতক্ষণে বরং বুঝলেন, আকাশে পাঁচটা সূর্য নয়, ওগুলো কোনো রকমের কৃত্রিম আলো যার ফলে চারদিকটা দিনের মতো দেখাচ্ছে। সম্ভবত ওগুলো পৃথিবীর অন্য পাশের সূর্যের আলো থেকে এপাশে আলো প্রতিফলিত করছে। এ ধরনের একটা আইডিয়া একশো বছর আগে তাঁর মাথাতেও এসেছিল।

রামবাবু ফের জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তারিখটা কত বলবে বাবা?"

লোকটা অবাক চোখে ফের তাকিয়ে বলল, "জানুয়ারি, বিশ শো উনআশি।"

রামবাবু তা জানেন। তবু লোকটার সঙ্গে একটু খেজুরে আলাপ করছেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য অন্য। একশো বছর পর পৃথিবীতে কীরকম পরিবতন হবে না-হবে, মানুষ কতটা এগোবে না-এগোবে, তা তাঁর মোটামুটি আন্দাজ ছিল। সুতরাং তিনি চারদিকের পরিবর্তন দেখে খুব অবাক হননি। কিন্তু গয়েশের সঙ্গে একটা বাজি ছিল। সেইটে বড় খোঁচাচ্ছে।

রামবাবু বললেন, "আচ্ছা সুকিয়া স্ট্রীটটা কোন্‌দিকে বলতে পারো বাবা?"

লোকটা বলে, "সুকিয়া স্ট্রীট? সুকিয়া স্ট্রীট বলে কিছু শুনিনি তো!"

"নর্থ ক্যালকাটায়।"

লোকটা হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, "ক্যালকাটা? ওঃ, ক্যালকাটা নামে একটা গ্রাম আছে বটে। সে তো অনেক উত্তর দিকে।"

"এ শহরটার নাম কী বাবা?"

"এ হল গোসাবা, সুন্দরবন।"

"বটে! গোসাবার এত উন্নতি?" বলে রামবাবু চোখ কপালে তোলেন।

লোকটা হঠাৎ রামবাবুর একটা হাত খপ করে ধরে বলল, "আচ্ছা, আপনি কি রামবাবু? একশো বছর আগে যাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল?"

রামবাবু খুব জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "আমি সে-ই। কী করে বুঝলে বাবা?"

"বুঝব না? আপনার ঘুমন্ত মুখের ছবি যে প্রায়ই টেলিভিশনে দেখানো হয়। খবরের কাগজেও বেরোয়।"

"তাই বুঝি?" বলে খুব হাসলেন রামবাবু। বললেন, "তা কলকাতার কী হল বলতে পারো বাবা?"

"সে তো আরো সত্তর-আশি বছর আগেই মশা, লোড-শেডিং আর জলের অভাবে হেজে গিয়েছিল। শহরে জঙ্গল গজিয়ে যায়। তারপর এখন অবশ্য কলকাতা আবার বর্ধিষ্ণু গ্রাম হয়ে উঠছে। ভাল চাষবাস হচ্ছে। চৌরঙ্গির আলু খুব বিখ্যাত, বাগবাজারের কুমড়ো পৃথিবীর সেরা, খিদিরপুরে মোচার সাইজের পটল জন্মায়। তাছাড়া কলকাতায় এখন 'মশা বাঁচাও' আন্দোলনের একটা হেড কোয়ার্টার হয়েছে।"

"বটে? সে আবার কী? মশা বাঁচাবে কেন বাবা?"

"মশা মেরে-মেরে মানুষ তো মশার প্রজাতিই ধ্বংস করে দিয়েছিল কিনা। যেমন একসময় আপনারা বাঘ-সিংহ মেরে মেরে সব প্রায় নিকেশ করেছিলেন। পরে আপনারা যেমন 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' করে বাঘ বাঁচাতে চেয়েছিলেন, এখন ঠিক সেইভাবেই মশা জিয়োনোর চেষ্টা চলছে।"

রামবাবু এবার আসল কথাটায় এলেন। খুব সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বাবা, একটা কথা বলবে? খুব সাবধানে বোলো। তেমন শকিং কিছু শুনলে আমার বুড়ো হার্ট থেমে যেতে পারে। এখনকার বাজারদরটা কীরকম বলতে পারো?"

"বাজারদর?" লোকটা একটু অবাক হয়, হেসেও ফেলে। বলে, "খুব চড়া।"

"খুব?" বলে রামবাবু বড় বড় চোখে তাকান। গয়েশের সঙ্গে এই নিয়েই বাজি। গয়েশ বলেছিল, একশো বছর পর বাজারদর হবে একশো গুণ, রামবাবু বলেছিলেন, কক্ষনো না। দশগুণ বড়জোর হতে পারে। রামবাবুর বুকটা তাই ঢিবঢিব করছিল। বললেন, "তবু বলো বাবা, শুনে রাখি। আচ্ছা, আগে বলো চাল কত করে।"

"চাল?" লোকটা হাসিমুখেই বলে, "চাল যাচ্ছে তিন শো টাকা।"

রামবাবু শকটা সামলাতে পারলেন না। চোখ উল্টে ফেললেন, হাত-পা কাঠ হয়ে গেল, ভির্মি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে লোকটা বলল, "কিলো নয়, কিলো নয়। কুইন্টাল।"

রামবাবু আবার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে একটা শ্বাস ছাড়লেন। আর যা হোক তা হোক, বাজারদরটা ঠিক আছে।

ছবি সুধীর মৈত্র

কে?

বিমল মিত্র

কোনও দিন কেউ ভাবেনি যে, এমন হবে!

আগেও কেউ আভাস পায়নি কিছু। চাটুজ্যে-বাড়ির বৈঠকখানায় সেদিনও যথারীতি বৈঠক বসেছে। পাড়ার দু-চারজন বুড়ো মানুষ এসে চাটুজ্যে মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করে গেছে। জয়রাম চট্টোপাধ্যায় এককালে জমিদার ছিলেন। জমিদারি কবে আইন করে উঠে গেছে। জমিদারি বিক্রি করে যে-টাকা তিনি পেয়েছেন তা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে মোটা সুদ পাচ্ছেন আর সেই টাকায় তাঁর সংসার চলছে।

তার মানে টাকা-কড়ির ব্যাপারে তাঁর কোনও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা নেই।

একটি মাত্র ছেলে রেখে তাঁর স্ত্রী অনেক দিন আগে মারা গেছেন। সেই ছেলেকে নিয়েই তাঁর যত কিছু স্বপ্ন আর কল্পনা। আদর করে তিনি সেই ছেলের নাম রেখেছেন—জ্যোতিষ্ক। তিনি তাকে জ্যোতি বলে ডাকেন।

বলেন, "বড় হয়ে জ্যোতি খুব বুদ্ধিমান হবে, জানেন মল্লিক মশাই।"

মল্লিক মশাই বলেন, "আপনার ছেলে

ধারাবাহিক
উপন্যাস

ছোটদের যত সেরা বই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের এক দারুণ প্রিয় নাম। তাঁর কবিতার বই বা গল্প-উপন্যাস নিয়ে বড়োদের জগতে যতটা হইচই, তার থেকেও অনেক বেশি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় তাঁর কিশোর-উপন্যাস নিয়ে। কেননা বয়স-নির্বিশেষে ছোট-বড়ো সব্বাই তাঁর এইসব অ্যাড-ভেনচার কাহিনীর ভক্ত। অথচ প্রত্যেকটি কাহিনীই নতুন ও আলাদা রকমের। কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্য অভিজ্ঞতার মিল নেই। যেমন রোমাঞ্চকর সব কাহিনী, তেমনই জমজমাট তাঁর গল্প-বলার ভঙ্গি। আরম্ভ করলে শেষ না করে উপায় নেই, আর শেষ হলেই ইচ্ছে হয়, আবার শুরু করি।

পূর্ণেন্দু পত্রী কলকাতা নিয়ে দু-খানি আশ্চর্য বই লিখেছেন। একটিতে তিনি শুনিয়েছেন এই শহর কলকাতার গড়ে ওঠার কাহিনী। আর অন্যটিতে শুনিয়েছেন কলকাতাকে নিয়ে চলতি বহু ছড়ার পিছনের কাহিনী, গল্পগাথা আর ইতিহাস। দুটি বইই দারুণ কৌতূহলকর। একটি যদি রূপ-কথা, অন্যটি তবে অপরূপকথা। শুধু লেখা দিয়েই নয়, রেখা দিয়েও বই দুখানি সাজিয়ে দিয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। শুধু ছোটদের নয়, বড়োদেরও জানবার মতো বহু আকর্ষণ বই দুটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়ানো। তেমনই আকর্ষণ এই দুটি বইয়ের মন-কেড়ে-নেওয়া দুর্দান্ত সব ছবির।

বুদ্ধদেব গুহর ঝন্টুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫ **ননীগোপাল চক্রবর্তীর** চরকাবুড়ি ৪ যাদু-ঘরে চল যাই ৬ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৪ স্ট্রাইকার ৬ স্টপার ১০ কোনি ৭ **বিমল করের** ওআণ্ডার মামা ৬ কাপালিকরা এখনও আছে ৭ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১০ **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী** ও **বিমল দাসের** সাদা বাঘ ১০ **অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর** শাদা ঘোড়া ৮ **অজেয় রায়ের** ফেরোমন ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ **গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু** ও **নরমুখ চৌধুরীর** নিশীথ রাতের আহ্বান ৩ **গৌর-কিশোর ঘোষের** দুষ্টুর দুপুর ৪ **আনন্দ বাগচীর** বনের খাঁচায় ৬ **মনোজ বসুর** ওস্তাদ নটবর ৬ **শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪ **শিশির করের** গঙ্গায় বাঘ ৪ **লীলা মজুমদারের** বাতাসবাড়ি ৫ **অমরনাথ রায়ের** দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০ **আশাপূর্ণা দেবীর** রাজ-কুমারের পোশাকে ৪ **সমরেশ বসুর** মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৬ **অমিতাভ চৌধুরীর** তেপান্তরের মাঠে ৪ **গিরিধারী কুণ্ডুর** টংসা চু ৫ **বিমল মিত্রের** রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮ **শিশিরকুমার মজুমদারের** তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫ **অন্নদাশংকর রায়ের** হৈ রে বাবুই হৈ ৫ **মণিলাল সেনের** ডাকাবুকো ৫ **রেবন্ত গোস্বামীর** অনুমিতুদের কথা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অশ্রুখনি ৫ **সত্যজিৎ রায়ের** নানা স্বাদের কাহিনী : এক ডজন গপ্‌পো ১০ আরো এক ডজন ১০ ফটিকচাঁদ ৮ **শিবরাম চক্রবর্তীর** হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪ শিব্রামের বারো আড়ি ৫ দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬ **পূর্ণানন্দ চট্টো-পাধ্যায়ের** মাধুরীলতার চিঠি ৫ **নারায়ণ চক্রবর্তীর** হলদে সবুজ কৃষ্ণাল ১০ **সমরজিৎ করের** একটি সংকেতের জন্যে ৬ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৪ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪ **সত্যজিৎ রায়ের** গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-উপন্যাস : বাদশাহী আংটি ৫ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৬ সোনার কেল্লা ৬ বাক্স-রহস্য ৫ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৬ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫ জয়বাবা ফেলুনাথ ৬ ফেলুদা এণ্ড কোং ৮ গোরস্থানে সাবধান ৮ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ভয়ংকর সুন্দর ৫ সত্যি রাজপুত্র ৫ তিন নম্বর চোখ ৫ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬ সবুজ দ্বীপের রাজা ৫ **শংকরীপ্রসাদ বসুর** আমাদের নিবেদিতা ৬

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

বুদ্ধিমান হবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে ?''

জয়রামবাবু বলেন, ''আরে তা কি আর বলা যায় ? যে যার বুদ্ধি নিয়ে পৃথিবীতে আসে! ভগবান এক-একজনকে এক-একরকম বুদ্ধি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। কত বড়-বড় লোকের ছেলেকে নিরেট মুখ্যু হতে দেখেছি আমি। অনেককে দেখেছি বাপ ফুটফুটে ফরসা আর সেই বাপেরই ছেলে আবার একেবারে আবলুশ কাঠের মতো কালো।''

যারা জয়রাম চাটুজ্যের বৈঠকখানায় এসে জোটে, তারা চাটুজ্যে মশায়ের কথা হাঁ করে গেলে। এখানে যারা আসে তাদের জন্যে ঢালাও চায়ের বন্দোবস্ত আছে। খাও দাও গল্প করো আর তারপর যখন ভেতর থেকে চাটুজ্যে মশাইয়ের খাওয়ার ডাক আসবে তখন উঠে যাও।

বাড়িতে দুটি তো মাত্র প্রাণী।

এক চাটুজ্যে মশাই, আর দুই হচ্ছে তাঁর ছেলে !

কিন্তু হলে কী হবে, এক গাদা লোক বাড়িতে সব সময়ে হাজির এই দুজনকে দেখা-শোনা করবার জন্যে।

একজন মাস্টারমশাই আসেন ওই জ্যোতিষ্ককে পড়াতে। জয়রামবাবু তাকে জিজ্ঞেস করেন, ''কেমন পড়ছে জ্যোতি ?''

মাস্টারমশাই বলেন, ''জ্যোতি খুব ইন-টেলিজেন্ট হবে। এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। যা পড়াই সব মুখস্থ করে ফেলে।''

জয়রামবাবু বলেন ''তাই নাকি ? তবে কী জানো মাস্টার, ছোটবেলাটা দেখে কিছু বলা যায় না। আমি ছোটবেলায় খুব বোকা ছিলাম। আমার বাবা বলতেন যে, আমাকে দিয়ে নাকি কোনও কাজ হবে না, কিন্তু এখন ?''

প্রতিদিনই চাটুজ্যে মশাইয়ের বৈঠকখানায় গল্প হত আর প্রতিদিনই মাস্টারমশাইকে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, জ্যোতি কেমন পড়ছে !

কিন্তু কোনও দিনই কেউ ভাবেনি যে এমন হবে !

এক ঘণ্টা আগেও কিছু আভাস পায়নি কেউ !

সন্ধেবেলা বৈঠকখানায় প্রতিদিনকার মতো গল্প করছিলেন জয়রামবাবু। বিকেলবেলা

গোপাল রোজ জ্যোতিকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে যায়। সেদিনও সেই রকম বেড়াতে গিয়েছিল। প্রত্যেক দিন বিকেলে বেড়াতে যাবার আগে বাবা সাবধান করে দেন গোপালকে।

বলেন, ''দেখিস রে, খুব সাবধানে নিয়ে যাস জ্যোতিকে।''

গোপাল বলে, ''হ্যাঁ বাবু, আমি খোকা-বাবুকে খুব সাবধানে নিয়ে যাই।''

জ্যোতিকে একটা নতুন বল কিনে দিয়েছেন তিনি। জ্যোতি সেই বল পেয়ে খুব খুশি। সে পার্কে গিয়ে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলে।

বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয় পার্কটা। জয়রামবাবু যখন ছোট ছিলেন, তখন তিনিও ওই পার্কে গিয়ে পাড়ার অন্য ছেলেদের সঙ্গে বল খেলেছেন। তখন পাড়ায় এত লোক ছিল না। তাঁর এই বাড়ির আশেপাশে অনেক ফাঁকা জমি পড়ে ছিল। রাস্তাতেও এত গাড়িঘোড়া ছিল না তখন। যখন জ্যোতি আরো ছোট ছিল, তখন তিনি নিজে জ্যোতির সঙ্গে বল নিয়ে খেলতেন। কিন্তু বাড়িতে আর অত জায়গা

বিশিষ্ট কিশোর প্রকাশন

মঞ্জিল সেন

নীলপাখীর পালক

একটি ভালো ছেলের বড় হয়ে উঠবার জমাটি গল্প। সচিত্র। ৫·০০

ময়ূখ চৌধুরী

সংখ্যার নাম চার

বাঘের মত ভয়ংকর একটি মানুষের হাতে হাত মিলিয়েছিল দুঃসাহসী এক কিশোর, এক মল্লবীর ও তীরন্দাজ। কেন? বিস্মৃত অতীতের জীবন্ত কাহিনী। ১০·০০

সঙ্কর্ষণ রায়

বন্যরা বনে

শিকার, বন্যপ্রাণী ও বন—যেন এক স্বপ্নবিহার। সচিত্র। ১০·০০

নির্বেদ রায়

অরণ্যের অন্তরালে

শিকারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নানা দেশে। সচিত্র। ৬·০০

অনীশ দেব

নরকে আমিই রাজা

৬·০০

শৈলেন মুখোপাধ্যায়

রুমঝুম্

স্বরলিপিসহ কিশোর নাটিকা। ক্লাব ও স্কুলের উপযোগী। ১০·০০

ডঃ মিহির মুখোপাধ্যায়

জমি ও ফসল

পশ্চিমবাংলার যে-কোন অঞ্চলের জমি থেকে সব চেয়ে ভালো ফসল পা'বার চাবিকাঠি দিচ্ছেন একজন অভিজ্ঞ কৃষি-বিজ্ঞানী। ৬·০০

ফার্মা কে এল এম (প্রা) লিঃ
২৫৭-বি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২, (দূরভাষ ২৭৪৩৯১)

কোথায়-? বাড়ির মধ্যে বল খেলে ঠিক আরাম পেত না জ্যোতি।

জ্যোতি বলত, "আমি বাইরে যাব বাবা।"

তিনি বলতেন "না, বাইরে যেতে নেই।"

জ্যোতি জিজ্ঞেস করত, "কেন, বাইরে যেতে নেই কেন? বাইরে গেলে কী হয়েছে?"

তিনি ভয় দেখাতেন। বলতেন, "না, বাইরে বুড়ো আছে। বুড়ো তোমায় ধরবে।"

জ্যোতি জিজ্ঞেস করত, "বুড়ো আমাকে ধরে কী করবে?"

তিনি ভয় দেখাবার জন্যে বলতেন, "বুড়ো তোমাকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেলবে!"

জ্যোতি তবুও নাছোড়বান্দা। প্রত্যেক ব্যাপারেই তার কৌতূহল। বলত, "গিলে খেয়ে কী করবে?"

"গিলে খেয়ে আবার কী করবে, গিলে খেলে তুমি মরে যাবে!"

মরে যাবার কথা শুনেও জ্যোতি ভয় পেত না। বলত, "মরে গেলে কী হবে?"

জ্যোতির প্রশ্নের চোটে তিনি পাগল হয়ে যেতেন। বিরক্ত হয়ে বলতেন, "আমি পারিনে বাপু তোর কথার জবাব দিতে। তাহলে তুই যা ইচ্ছে তোর কর!"

এ-সব জ্যোতির ছেলেবেলাকার কথা। একেবারে ছেলেবেলা। তখন জ্যোতির মা মারা গেছেন। বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেছে একেবারে। জ্যোতির সঙ্গে সারাদিন কথা বলেই যতটুকু সময় কাটে।

কিন্তু জ্যোতি যতক্ষণ কথা বলবে ততক্ষণ একেবারে কথার খই ফুটবে তার মুখ দিয়ে। যদি জ্যোতি দেখে যে আকাশে চাঁদ উঠেছে তো জিজ্ঞেস করবে, "ওটা কী বাবা?"

তিনি বলবেন "ওটা চাঁদ।"

জ্যোতি জিজ্ঞেস করবে, "চাঁদ আকাশে উঠেছে কেন?"

তিনি বলবেন, "আলো দেবার জন্যে।"

তখন জ্যোতি আবার জিজ্ঞেস করবে, "চাঁদ কী দিয়ে আকাশে উঠল?"

তিনি বলবেন, "সিঁড়ি দিয়ে।"

তখন জ্যোতি বায়না ধরবে। বলবে, "আমাকে একটা সিঁড়ি কিনে দাও না—"

তিনি বলবেন, "সিঁড়ি দিয়ে তুই কী করবি?"

"আমিও সিঁড়ি দিয়ে আকাশে উঠব!"

এর পরে তিনি হাল ছেড়ে দিতেন। সঙ্গে

সঙ্গে তিনি বাড়ির কাউকে ডাকতেন—"ওরে ভৈরব, ওরে কৈলাস, কেউ আছিস? একে নিয়ে যা!"

তখন জ্যোতি তাঁকে জড়িয়ে ধরত দু'হাত দিয়ে। তাঁকে ছেড়ে আর কারোর কাছে যেতে চাইত না সে!

তিনি বলতেন, "আর দুষ্টুমি করবি না তো?"

জ্যোতি বলতেন, "না বাবা, আমি আর দুষ্টুমি করব না।"

"দুষ্টুমি করলেই আমি ভৈরবকে ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে বলব। সে তোমাকে হালুম-বুড়োর কাছে ধরে নিয়ে যাবে।"

আবার প্রশ্ন, "হালুম-বুড়ো কে বাবা?"

"হালুম-বুড়ো একজন রাক্ষস। ছোট ছেলে দেখলেই রাক্ষস তাকে খেয়ে নেয়—"

"রাক্ষসের বাড়ি কোথায়?"

"সে অনেক দূরে।"

"অনেক দূর থেকে রাক্ষস কী করে এখানে আসবে?"

"উড়ে উড়ে—"

যতক্ষণ জ্যোতি বিছানায় গিয়ে না ঘুমিয়ে পড়বে ততক্ষণ কথা। কথা দিয়ে সে পাগল করে মারবে জয়রামবাবুকে।

তারপর যখন জ্যোতি একটু বড় হল তখন এই গোপালকে রাখা হল তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে।

প্রত্যেকদিন জয়রামবাবু গোপালকে সাবধান করে দিতেন। বলতেন, "সব সময় খোকাবাবুর পাশে-পাশে থাকবি তুই, বুঝলি? বাজে ছেলেদের সঙ্গে খোকাবাবুকে মিশতে দিবি না, বুঝলি?"

গোপাল মাথা নাড়াত। বলত, "না বাবু, আমি সব সময় খোকাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাকব, আপনি ভাববেন না।"

তিনি আবার সাবধান করে দিতেন। বলতেন, "রাস্তাঘাট দেখে পার হবি বুঝলি? হাত ধরে নিয়ে যাবি খোকাবাবুকে।"

গোপাল বিকেল চারটে সাড়ে-চারটের সময় জ্যোতিকে নিয়ে বেড়াতে যেত আর ফিরে আসত সন্ধে হবার আগেই।

তিনি জিজ্ঞেস করতেন, "পার্কে গিয়ে আজ কী করল রে খোকাবাবু?"

গোপাল বলত, "আজ্ঞে ছেলেদের সঙ্গে বল খেলেছে।"

তিনি বলতেন, "কোনও বাজে ছেলের সঙ্গে মিশতে দিসনি তো?"

গোপাল বলত, "না হুজুর, কোনও বাজে ছেলের সঙ্গে মিশতে দিইনি খোকাবাবুকে।"

তিনি তবু সাবধান করে দিতেন, "হুঁ, যদি কখনও শুনেছি যে, তুমি বাজে ছেলেদের সঙ্গে খোকাবাবুকে মিশতে দিয়েছ তো আমি তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব, এই বলে রাখছি আজ।"

সত্যি, কোনও দিন কেউ ভাবেনি যে, এমন হবে।

একঘণ্টা আগেও কেউ আভাস পায়নি কিছু।

সেদিন তিনিও কিছু সন্দেহ করেননি। ঘড়িতে কটা বেজেছে গল্প করতে-করতে তারও খেয়াল ছিল না তাঁর।

হঠাৎ দেখেন কাঁদতে-কাঁদতে গোপাল দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বললেন, "কী হয়েছে রে? কী হয়েছে কাঁদছিস কেন?"

তবু কিছু জবাব নেই গোপালের মুখে। সে তখনও কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে সে জয়রামবাবুর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল।

তখন যেন জয়রামবাবুর মাথার ওপর বজ্রাঘাত হল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "বল কী হয়েছে? কেঁদে কী হবে? কথা বল?"

মল্লিক মশাই, দত্ত মশাই সবাই তখন ভয়ে একেবারে শিউরে উঠেছেন।

জয়রামবাবু গোপালের হাতটা ধরে এক টান দিলেন। গোপাল সে ধাক্কা খেয়ে আরো ভয় পেয়ে গেল। সে আরো জোরে কাঁদতে লাগল তখন।

বাড়ির ভেতর থেকে ভৈরব, কৈলাস, সবাই উঁকি মেরে লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখতে এসেছে বৈঠকখানায় কী হয়েছে।

জয়রামবাবু আবার চিৎকার করে উঠলেন, "বল শিগগির, কী হয়েছে বল।"

গোপাল কাঁদতে-কাঁদতে কোনও রকমে বলতে পারলে, "খোকাবাবু হারিয়ে গেছে বাবু!"

(ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়

পড়ার সময়

শ্যামল পুরকায়স্থ

পড়ার মধ্যে ঐ তো পড়া,
দেশ-বিদেশের যত ছড়া—
সন্ধে হলেই ঘুমে ঢুলু ঢুলু।

তন্দ্রাঘোরে রকমসকম—
দুলছে ময়ূর, মেলছে পেখম;
পা জড়িয়ে মিনির হুলুস্থুলু।

ঠিক তখনি হনহনিয়ে
ঘুম ভাঙানি অংক নিয়ে
দাদামশাই হাজির।

সত্যি কি চোখ ছলোছলো !
বায়না ধরে, 'গল্প বলো
গোয়ালন্দের মাঝির—'

বললে দাদু ফোকলা দাঁতে,
'মাঝি ও তিন ছেলের পাতে
আটটা মাছ—কে পায় ভাগে ক'টা ?'

'পুষির কথা বললে না যে,
এ গল্পটা ভীষণ বাজে—
আচ্ছা দাদুন, শিবের কেন জটা ?'

ছবি দেবাশিস দেব

ছবির মজা

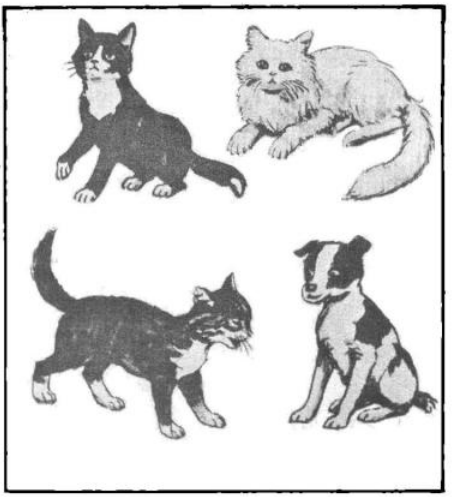

তোমার ছোট্ট ভাই কিংবা বোনকে জিজ্ঞেস করো, চারটি প্রাণীর মধ্যে কোন্‌টি আলাদা ?

এই ছবির মধ্যে একটি চায়ের কাপ লুকোনো আছে। তোমার ছোট্ট ভাই আর বোনকে বলো, কাপটা তারা খুঁজে বার করুক।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

পাহাড়তলির জঙ্গলে কাঠ কাটছে সদাশিব।

দূরে, উপত্যকা পেরিয়ে, আরেকটা পাহাড়ি গাঁ। সেই দিকে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে এক দঙ্গল ঘোড়সওয়ার।

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

গুরু ! গুরু !
গলায় যখন মেলচেস্টারের স্কার্ফ নেই, তখন নিশ্চয় রদারটনের সমর্থক
রয়কে মারবে নাকি ?

র‍্যাকি এসে রয়ের পাশে দাঁড়াল...
আমাকে মারতে চায় বলে তো মনে হচ্ছে না !
কী চায় ?

যে-পায়ে গোল দিয়েছি, সেই পায়ে পেন্নাম ঠুকতে চায় !
তাহলে তো আমাদেরই সমর্থক !

নিশ্চয় ! উঃ, আজ যে কী আনন্দ আমার !
কিন্তু তাই বলে এইভাবে মাঠে ঢোকা...

উচিত হয়নি। যাও, এক্ষুনি মাঠ ছেড়ে চলে যাও !
যাচ্ছি, কিন্তু আরেকটা গোল চাই রয় !

রয়, ওকে পুলিসে দেওয়া উচিত ছিল !
এইবারটি ওকে ক্ষমা করে দিন !

এরাই আমাদের সমর্থক ! এদেরই আনন্দ দেবার জন্যে আমরা খেলতে নামি !

খেলা চলছে !
র‍্যাকি, যারা মাঠে এসে নৃত্য করে, তাদের পুলিসে দেওয়াই উচিত !
ঠিক বলেছ লফটি ! নয়তো এরা আশকারা পেয়ে যায় !

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

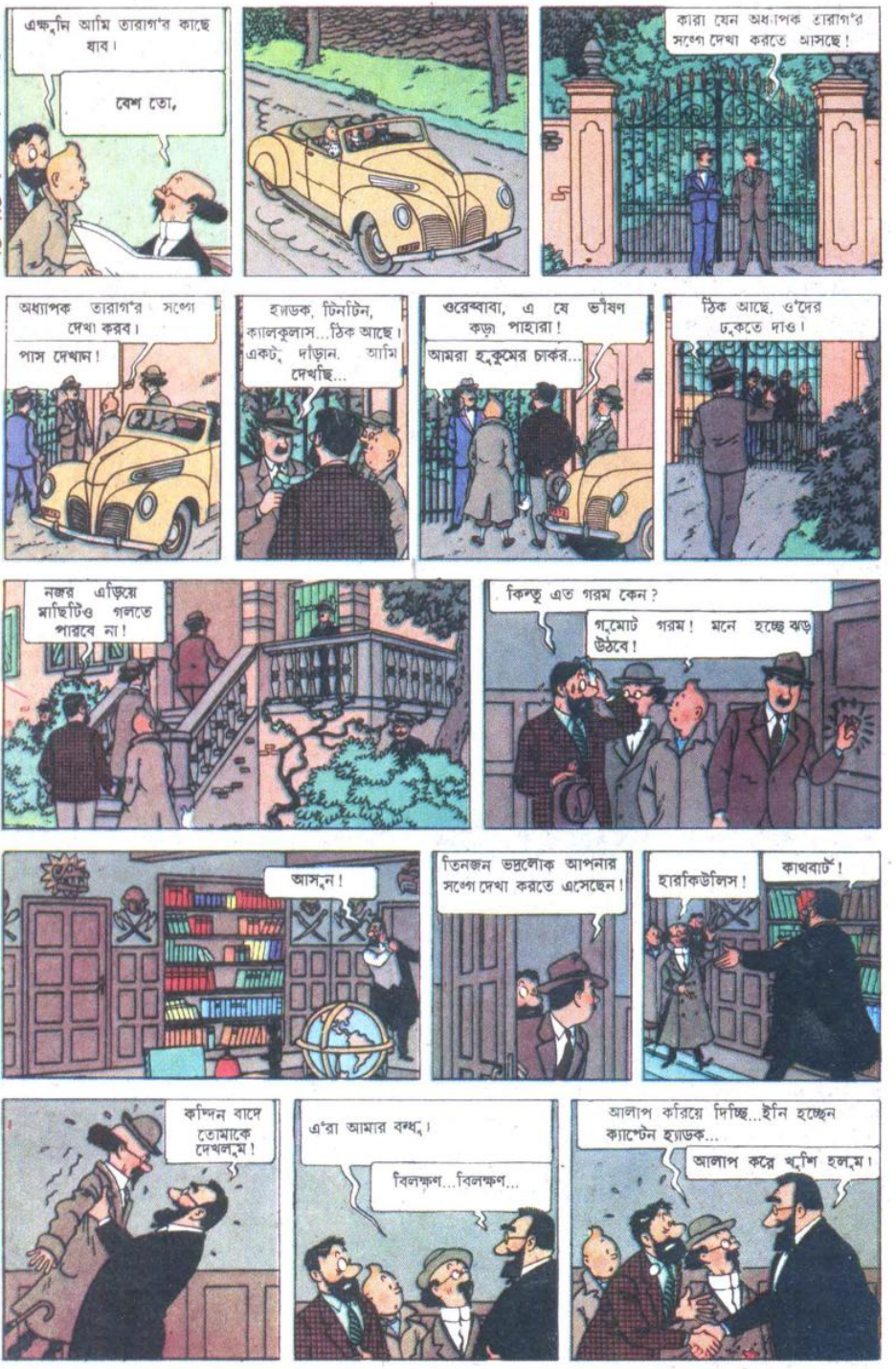
এক্ষুনি আমি তারাগ'র কাছে যাব।
বেশ তো,
কারা যেন অধ্যাপক তারাগ'র সঙ্গে দেখা করতে আসছে!
অধ্যাপক তারাগ'র সঙ্গে দেখা করব।
পাস দেখান!
হ্যাডক, টিনটিন, ক্যালকুলাস...ঠিক আছে। একটু দাঁড়ান, আমি দেখছি...
ওরেব্বাবা, এ যে ভীষণ কড়া পাহারা!
আমরা হুকুমের চাকর...
ঠিক আছে, ওঁদের ঢুকতে দাও।
নজর এড়িয়ে মাছিটিও গলতে পারবে না!
কিন্তু এত গরম কেন?
গুমোট গরম! মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে!
আসুন!
তিনজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন!
হারকিউলিস!
কাথবার্ট!
কদ্দিন বাদে তোমাকে দেখলুম!
এঁরা আমার বন্ধু।
বিলক্ষণ...বিলক্ষণ...
আলাপ করিয়ে দিচ্ছি...ইনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন হ্যাডক...
আলাপ করে খুশি হলুম।

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

এদিকে ফরাসিরা যদিও...

যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে জোর লড়ে হায়, শেষপর্যন্ত কিন্তু হেরে যায় তারা। ফলাফল ২—৩।

পরের রাউন্ডে উঠতে হলে স্কট্‌ল্যান্ডকে হারাতে হবেই। তা ফ্রান্স ২—১ গোলে হারায়ও।

ফরাসী ফরোয়ার্ড ফঁতাইন সেদিন দারুণ খেলেছিলেন।

ইংল্যান্ডের সঙ্গে ড্র করবার পরে ব্রাজিল দলে একটা মস্ত পরিবর্তন ঘটে। রাশিয়ার সঙ্গে খেলায় তারা নতুন একটি ছেলেকে মাঠে নামায়। ছেলেটির নাম পেলে।

এক সাংবাদিক লেখেনঃ মনে হচ্ছে এই নতুন ছেলেটি দারুণ খেলবে।

রাশিয়ার গোলরক্ষক লেভ ইয়াসিনের দক্ষতা ছিল অতুলনীয়, কিন্তু...

সেদিনকার খেলায় ব্রাজিলের ভাভা তাকে দু' দুবার পরাস্ত করেন।

যে আটটি দল শেষপর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে, তাদের প্রতিযোগিতার ছক অতঃপর এইভাবে সাজানো হয়।
ব্রাজিল বনাম ওয়েলস
সুইডেন বনাম রাশিয়া
পঃ জার্মানি বনাম যুগোস্লাভিয়া
ফ্রান্স বনাম উঃ আয়ার্ল্যান্ড

ওয়েলস কিন্তু খুব লড়েছিল, নিলটন সান্টোসের গোলে ব্রাজিল এগিয়ে যায়, আর...

ব্রাজিলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন পেলে। সে এক তাক- লাগানো গোল। সেই গোলের কথা...

পেলে আজও মনে রেখেছেন।

সুইডেনের সঙ্গে রাশিয়ার খেলার দিনে গোটা মাঠে প্রবল উত্তেজনা। সুইডেন সেদিন দু'গোলে জেতে। গোল দুটি করেন...

হামরিন আর সিমনসন।

মাঠে উপস্থিত সকলেই সেদিন বুঝে যান যে, সুইডেন শেষপর্যন্ত ফাইনালে যাবেই।

মালমো শহরে পশ্চিম জার্মানি ১—০ গোলে যুগোস্লাভিয়াকে হারিয়ে দেয়।

ফ্রান্সের সঙ্গে উঃ আয়ার্ল্যান্ডের খেলার দিনেও উত্তেজনা কিছু কম ছিল না। ফরাসি দল তাদের

জাতীয় সংগীত গাইতে-গাইতে মাঠে নামে...

খেলার আগে ফরাসি দলের ম্যানেজার পল নিকোলাস তাঁদের সেরা ফরোয়ার্ড কোপাকে কিছু পরামর্শ দেন...

কোপা সেদিন সত্যিই খুব ভাল খেলেছিলেন...

আর ভাল খেলেছিলেন ফঁতাইন।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

জাম্বেসি

দিদিমণি

জাম্বেসি আফ্রিকার চতুর্থ দীর্ঘতম নদী। এই মহাদেশের দক্ষিণ অংশ দিয়ে বয়ে গেছে। এই নদী আফ্রিকার মালভূমি থেকে বেরিয়ে পূর্ব দিকে ২,২০০ মাইল বয়ে গিয়ে ভারত মহাসাগরে পড়েছে। উপনদী সহ এই নদীর অববাহিকার আয়তন ৫০০,০০০ বর্গমাইল বা ১,২৯৫,০০০ বর্গ-কিলোমিটার। আফ্রিকার বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত এই নদীতেই আছে।

এই নদীর বিখ্যাত কারিবা বাঁধ থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। নদীটি ছ'টি রাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে এবং কোনো কোনো রাষ্ট্রের সীমাও নির্ধারণ করেছে। রাষ্ট্রগুলির নাম—অ্যাঙ্গোলা, জাম্বিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, বটস্ওয়ানা, রোডেশিয়া, এবং মোজাম্বিক।

জাম্বেসি জাম্বিয়ার কেলেনে পাহাড়ের নিকটবর্তী জলাভূমি থেকে বেরিয়েছে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে এই জায়গার উচ্চতা ৪,৮০০ ফুট। এখান থেকে বেরিয়ে প্রায় কুড়ি মাইল উত্তরে নদী বয়ে গেছে। তারপর এই নদী পশ্চিমে ও দক্ষিণে বেঁকে অ্যাঙ্গোলা রাজ্যের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে। নদী প্রথমে ১০০০ ফুট নীচে নেমে অনেকগুলি উপনদীর সঙ্গে মিশেছে, তারপর জাম্বিয়ায় প্রবেশ করে হঠাৎ চওড়া হয়ে গেছে। চওড়া জলাভূমির ওপর দিয়ে অগভীর খাত সৃষ্টি করে জাম্বেসি সমভূমির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে এই নদী। কালাহারি মরুভূমির উত্তর দিকের বালুকাময় এক অংশ গ্রীষ্মকালে এই নদীর জলে প্লাবিত হয়। ফলে, এই অঞ্চল ভরে যায় উর্বর পলিমাটিতে। জাম্বেসি নদীর উত্তর ভাগের প্রধান দুটি উপনদীর নাম কাবোম্পো এবং লুঙ্গওয়েবুঙ্গু।

৩,২৩০ ফুট উচ্চভাগ দিয়ে বয়ে যেতে নদী কোথাও কোথাও জলপ্রপাত ও খরস্রোতের সৃষ্টি করে।

এর পরে ৮০ মাইল ধরে জাম্বেসি নদীর গতিপথ জাম্বিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার সীমানা সূচিত করে। নদী জাম্বিয়া ও রোডেশিয়ার সীমানাও সূচিত করে, তারপর পূর্ব দিকে বেঁকে যায়। ২,৯০০ ফুট উঁচু থেকে নীচে পড়ে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে এই নদী।

জাম্বেসি নদীর মধ্যভাগ ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত থেকে আরম্ভ হয় এবং এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০ মাইল। মোজাম্বিক রাজ্যে প্রবেশ করার আগে এই নদী জাম্বিয়া রোডেশিয়ার সীমানা নির্ধারণ করেছে। মোজাম্বিকে প্রবেশ করে বৃহত্তম উপনদী কাফিউয়ের সঙ্গে মিশে পূর্ব দিকে বেঁকে গেছে। এই জায়গার নদী সরু গিরিখাতে প্রবেশ করেছে।

জাম্বেসি নদী মালভূমি ছেড়ে তীরবর্তী সমতল ভূমিতে নেমে আসে। চল্লিশ মাইল ধরে একটি গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়ার পরে মোজাম্বিক সমতলভূমিতে এসে নামে। ভিলা ফন্টেসের কাছে জাম্বেসি তার শেষ বড় উপনদী শিরে নদীর সঙ্গে মেশে।

মোহনার কাছে জাম্বেসি বালিয়াড়ি ও জলাভূমিপূর্ণ বদ্বীপের সৃষ্টি করেছে।

জাম্বেসি নদীর মোহনায় বালিয়াড়ি আছে। নদীর গতিপথের ১, ৬২০ মাইলে ছোট মাপের স্টীমার চলাচল করে। মোহনা থেকে ৪০০ মাইল দূরবর্তী কাহোরবাসা খরস্রোত পর্যন্ত স্টীমার চলাচল করতে পারে।

নদীর ওপর চারটি ব্রিজ রেল ও সড়কপথে যাতায়াতের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। নদীর মধ্যভাগে প্রায় ২,০০০ বর্গ মাইল জুড়ে আছে কারবা হ্রদ। জাম্বেসি নদীতে এবং এই হ্রদে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, এর মধ্যে তেলাপিয়া মাছই প্রধান। রেলপথে ও সড়কপথের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জলপথ হিসেবে জাম্বেসি নদীর গুরুত্ব এখন অনেক কমে গেছে।

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
ডেভিড ইনেস বেঁচে আছে ... কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না !
চোখ খোলা ... ঝুলন্ত রত্নটাকে দেখছে !
ইনেসের কাছে যেতে হবে ! লাফিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই !
দিই লাফ !
পেরেছি !
ইনেস, আমি টারজান ! শুনতে পাচ্ছ ?
মাহার ! বেরিয়ে যা আমার মন থেকে !
কী ব্যাপার ?
না, না, সান ফ্রানসিসকোকে নয় ! উঃ !
আরে, রত্নে শহরের প্রতিবিম্ব !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : সন্তু আর কাকাবাবু আবার একটা অভিযানে বেরিয়েছে। এবারে হিমালয় পাহাড়ে, এভারেস্ট-চূড়ার দিকে। ওরা এখন আছে গোরখশেপ নামে একটা জায়গায়। সেখানে চারদিকে শুধু বরফ আর একটা অনেক পুরনো আমলের গম্বুজ। সন্তু আর কাকাবাবু থাকে সেই গম্বুজের মধ্যে, আর বাইরে তাঁবুতে শেরপা আর মালবাহকরা। কাকাবাবু একটা ছোট কাচের বাক্সে একটা দাঁতের মতন জিনিস এনেছেন। সেটা সব সময় আগলে আগলে রাখেন। সন্ধের পর কাকাবাবু গম্বুজের চূড়ার কাছে বসে থাকেন চোখে একটা দূরবিন লাগিয়ে।

একদিন তিনি হঠাৎ উত্তেজিতভাবে সন্তুকে ডেকে বললেন, "দ্যাখ তো, দূরে কিছু নড়ছে কিনা?" তারপর—

॥ ৪ ॥

সন্তু চোখে দূরবিন লাগিয়ে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। শুধু আবছা আবছা অন্ধকার।

এখানকার আকাশ প্রায় কখনোই পরিষ্কার থাকে না। সব সময় মেঘলা-মেঘলা, তবু তারই ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে চাঁদের আলো এসে পড়ে।

সন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। কই, কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। দু' জায়গায় বরফে জ্যোৎস্না ঠিকরে ঝকঝক করছে। আর কিছু দূরে কালাপাথর নামে সেই ছোট পাহাড়টা। সেটা একেবারে মিশমিশে অন্ধকার।

কাকাবাবু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "দেখতে পেয়েছিস?"

"না তো!"

"একদম সোজা নয়, একটু ডান দিকে।"

সন্তু ডান দিক বাঁ দিক সব দিকেই দূরবিনটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। কোথাও কিছু নেই। কাকাবাবু কী দেখার কথা বলছেন? এই বরফের দেশে একটা পাখি পর্যন্ত নেই!

"এখনো দেখতে পাসনি?"

"না, কাকাবাবু!"

কাকাবাবু এবার সন্তুর কাছ থেকে দূরবিনটা নিয়ে নিজের চোখে লাগালেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, "সত্যিই তো এখন আর দেখতে পাচ্ছি না! অথচ একটু আগে স্পষ্ট দেখলাম যেন! তাহলে কি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার জন্য আমার চোখের ভুল হল?"

"কাকাবাবু, ওখানে কী থাকতে পারে?"

"সেটা ভাল করে না দেখলে বুঝব কী করে?"

আরও কিছুক্ষণ চোখে দূরবিন এঁটে বসে রইলেন কাকাবাবু। তারপর এক সময় হতাশ ভাবে বললেন, "নাঃ, আজ আর কিছু দেখা যাবে না! চল, এবার শুয়ে পড়ি!"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সন্তু তাড়াতাড়ি কোট-ফোট খুলে ফেলে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে গেল। কাকাবাবু নামলেন ধীরে-সুস্থে, কিন্তু তক্ষুনি শুয়ে পড়লেন না। একটা কালো রঙের খাতার পাতা উল্টে-উল্টে কী যেন দেখতে লাগলেন।

সন্তু ভাবল, কাকাবাবুর কি শীতও করে না? খানিকক্ষণ স্লিপিং ব্যাগের বাইরে থেকেই তো সন্তুর কাঁপুনি ধরে গেছে।

বিলিতি আলোটা এমন উজ্জ্বল যে, চোখে লাগে। ওটাকে আবার কমানো বাড়ানো যায়। আলোটা খানিকটা কমে যেতেই সন্তু বুঝতে পারল, কাকাবাবু এবার শুয়ে পড়েছেন।

কাকাবাবু একটা শব্দ করলেন, "আঃ!"

এই "আঃ" শুনেই বোঝা যায়, আজকের মতন কাকাবাবুর সব কাজ শেষ। এই শব্দটা করার ঠিক আধঘণ্টা বাদে কাকাবাবু ঘুমিয়ে পড়েন।

একবার ঘুম ভেঙে যাওয়ার জন্য সন্তুর আর সহজে ঘুম আসছে না। বিছানায় শুয়ে ঘুম না এলে এপাশ-ওপাশ ফিরে ছটফট করা যায়। কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে সহজে পাশ ফেরার উপায় নেই।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আমরা কি সত্যিই এভারেস্টের দিকে যাব?"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "দরকার হলে যেতে হবে নিশ্চয়ই!"

সন্তু ভাবল, দরকার আবার কী? দরকারের জন্য কেউ এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে যায় নাকি? কাকাবাবুর অনেক কথারই মানে বোঝা যায় না।

"আমরা এভারেস্টে উঠতে পারব, কাকাবাবু?"

"কেন পারব না? ইচ্ছে থাকলেই পারা যায়।"

কাকাবাবু খোঁড়া এবং কোনো খোঁড়া লোক অত উঁচু পাহাড়ে উঠতে পারে, এই কথাটা সব সময় সন্তুর মাথার মধ্যে ঘোরে। কিন্তু একথাটা তো কাকাবাবুকে মুখ ফুটে বলা যায় না। কাকাবাবুর ধারণা, তাঁর ইচ্ছে আর মনের জোর থাকলে মানুষ সব কাজই পারে।

ক্রাচ নিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় কাকাবাবু চলাফেরা করতে পারেন ঠিকই। কাশ্মীরে ঘুরেছেন, এখানেও তো সিয়াংবোচি থেকে এতটা পাহাড়ি চড়াই-উতরাই হেঁটে এসেছেন। দু'একবার অবশ্য পা পিছলে পড়েছেন, তাতে অবশ্য একটুও দমেননি।

কিন্তু এভারেস্টে ওঠা তো অন্য ব্যাপার। সন্তু ছবিতে দেখেছে যে, এভারেস্ট-অভিযাত্রীরা কোমরে দড়ি বেঁধে আর হাতে লোহার গাঁইতির মতন একটা জিনিস নিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে বেয়ে ওঠে, অনেকটা টিকটিকির মতন।

কাকাবাবু কি সেরকম পারবেন? যতই মনের জোর থাক, কোনো খোঁড়া মানুষের পক্ষে কি তা সম্ভব। শুধু মনের জোর নয়, কাকাবাবুর গায়েও খুব জোর আছে, কিন্তু তাঁর একটা পা যে অকেজো। একটা দুর্ঘটনায় কাকাবাবুর ঐ পা-টা নষ্ট হয়ে গেছে।

সন্তুর আর একটা কথাও মনে পড়ল। কলকাতায় তাদের বাড়িতে তেনজিং নোরগে এসেছিলেন। অনেকক্ষণ গোপনে কী সব কথা-বার্তার পর বিদায় নেবার সময় তেনজিং কাকাবাবুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, "গুড লাক। আই উইশ ইউ সাকসেস, মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি পারবেন...।" একথা সন্তু নিজের কানে শুনেছে। কাকাবাবুকে খোঁড়া দেখেও তেনজিং কেন বলেছিলেন, আপনি পারবেন? এভারেস্টে ওঠা কি এতই সহজ?

এই সব ভাবতে ভাবতে সন্তু যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তা সে টেরই পায়নি।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখল, কাকাবাবু আগেই উঠে পড়েছেন। ঘুম থেকে উঠেই কাকাবাবুর পড়াশুনো করার অভ্যেস। তা তিনি যখন যেখানেই থাকুন না কেন। আজও তিনি পড়তে শুরু করেছেন সেই কালো রঙের খাতাটা খুলে। কিছু-কিছু লিখছেনও মাঝে-মাঝে।

গম্বুজের লোহার দরজাটায় দুম্-দুম্ করে শব্দ হল।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু উঠেছিস? দরজাটা খুলে দে তো!"

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে, তাড়াতাড়ি ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে তারপর সন্তু দরজাটা খুলল।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মিংমা। তার হাতে একটা ফ্লাস্ক। সে ভিতরে ঢুকে পড়ে বলল, "দরজাটা বন্ধ কর দেও, সন্তু সাব!"

সন্তু দরজা বন্ধ করে দেবার আগেই কয়েক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এতগুলো গরম জামা ভেদ করেও তাতে হাড় পর্যন্ত কেঁপে যায়।

মিংমা দুটো প্লাস্টিকের গেলাসে চা ঢালল ফ্লাস্ক থেকে। ঐ গেলাসগুলো খুব গরম হয়ে যায়। কলকাতায় বসে ঐ রকম গেলাসে চা খাওয়ার খুব অসুবিধে, কিন্তু এখানে ঐ গরম গেলাস দু হাতে চেপে ধরেও খুব আরাম।

কাকাবাবু বললেন, "তুমিও এক গেলাস চা নাও, মিংমা! তারপর বলো, আজ হাওয়া কী রকম?"

উবু হয়ে বসে মিংমা বলল, "আজ হাওয়া বহুত কম হ্যায়, সাব! স্কাই বিলকুল ক্লিয়ার! ওয়েদার ফারসট্ কিলাস!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ!"

মিংমা উৎসাহ পেয়ে বলল, "সাব, আজ তাঁবু গুটাব? আজ সামনে যাওয়া হবে?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ! আরও কয়েকটা দিন থাকতে হবে এখানে!"

মিংমা আর সন্তু দুজনেই তাকাল দুজনের চোখের দিকে। দুজনের মনেই এক প্রশ্ন, এখানে থাকতে হবে কেন?

কাকাবাবু বললেন, "আর একটু চা দাও, আছে?"

রেলা বাড়ার পর যখন রোদ উঠল, তখন সন্তু বেরিয়ে এল গুহার বাইরে। মিংমা ছাড়া যে আর একজন শেরপা আছে, তার নাম নোবরু। সে একটু গম্ভীর ধরনের, মিংমার মতন অত হাসিখুশি নয়। তবে সে বেশ ভাল পুতুল বানাতে পারে। এখানে তো কয়েকদিন ধরে কোনো কাজ নেই, সে তাঁবুর বাইরে বসে ছুরি দিয়ে কাঠের টুকরো কেটে কেটে নানান রকম পুতুল বানায়। সন্তুকে সে একটা ভাল্লুক-পুতুল উপহার দিয়েছে।

মালবাহকরা সকাল থেকেই রান্নাবান্নায় মেতে যায়। আর তো কোনো কাজ নেই, সারাদিন ধরে খাওয়াটাই একমাত্র কাজ। মাল-বাহকরা রান্না করছে আর কাছেই বসে নোবরু একটা পুতুল বানাচ্ছে।

সন্তু তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। পুতুলটা প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। কিন্তু এটা কিসের পুতুল? কী-রকম যেন অদ্ভুত দেখতে। অনেকটা বাঁদরের মতন, কিন্তু পিঠটা বাঁকা আর হাত দুটো এত লম্বা যে, প্রায় পায়ের পাতা পর্যন্ত।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "নোরবু-ভাই, এটা কী?"

নোরবু মুখ না তুলে বলল, "টিজুতি!"

সন্তু বুঝতে পারল না। সে আবার জিজ্ঞেস করল, "টিজুতি? সেটা আবার কী?"

নোরবু বলল, "টিজুতি হ্যায়! টিজুতি!"

গম্ভীর স্বভাবের নোরবুর কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আর কিছু জানা যাবে না।

সে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। খানিকটা দূরে মিংমা একা-একা দাঁড়িয়ে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে। সে মাউথ অর্গান বাজিয়ে সময় কাটায়।

সে মিংমার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "মিংমা-ভাই, টিজুতি মানে কী?"

বাজনা থামিয়ে মিংমা হেসে জিজ্ঞেস করল, "কেন, হঠাৎ টিজুতির কথা পুছ্ছ কেন?"

"নোরবু-ভাই একটা পুতুল বানাচ্ছে। বলল, সেটা টিজুতি!"

মিংমা বলল, "ছোটা বাচ্চা, তোমার থেকেও থোড়াসা ছোটা, উসকো বোলতা টিজুতি। আর উসসে বড়া, এই হামারা মাফিক, তার নাম মিটি! আউর বহুত বড়া, আমার থেকেও অনেক বড় তার নাম ইয়েটি!"

সন্তুর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। ইয়েটি মানে কি ইয়েতি? তা হলে কাকাবাবু ইয়েতির খোঁজে এখানে এসে-ছেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! রোজ দূরবিন দিয়ে আর কী দেখবেন? কাচের বাক্সের জিনিসটা

পিণ্ডি

রবিদাস সাহারায়

গয়াতে দেয় পিণ্ডি সবাই,
ওটাই ভাল জায়গা,
বিন্দি বলে হিন্দি ভাষায়—
"রাওয়ালপিণ্ডি যায় গা।"
চণ্ডী বলে, "চণ্ডীগড়ে
পিণ্ডি দিলেও চলে।
উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে
তাই তো লোকে বলে।

তা হলে নিশ্চয়ই ইয়েতির দাঁত!

সন্তুর মনে পড়ল, অনেকদিন আগে সে 'টিনটিন ইন টিবেট' বলে একটা বই পড়েছিল। সে টিনটিনের অ্যাডভেন্চার-বইগুলোর খুব ভক্ত। 'টিনটিন ইন টিবেট' বইটাতে টিনটিন ইয়েতির সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু সে তো তিব্বতে।

তারপরই তার আবার মনে পড়ল, টিনটিন তো সেই গল্পে পাটনা থেকে নেপালে এসে তারপর তিব্বতের দিকে গিয়েছিল। এমনও তো হতে পারে যে, ঠিক এই জায়গাটাতেই এসেছিল টিনটিন?

সে উত্তেজিতভাবে মিংমার হাত চেপে ধরে বলল, "মিংমা-ভাই, তুমি ইয়েতি দেখেছ?"

মিংমা দু কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "নাঃ!"

সন্তু একটু নিরাশ হয়ে বলল, "দেখোনি? তা হলে জানলে কী করে যে ওরা তিনরকম হয়? টিজুতি, মিটি আর ইয়েতি?"

মিংমা বলল "সব লোগ এইসা বোলতা!"

"তুমি না দেখলেও আর কেউ দেখেনি? আর কোনো শেরপা কিংবা তোমাদের গাঁয়ের কোনো লোক?"

"না, সন্তু সাব! কেউ দেখেনি। দু-একঠো আদমি ঝুঠ বলে। লেকিন কোনো শেরপা ঝুঠ বলবে না! কোনো শেরপা দেখেনি। আমার বাবার এক বহুত বুঢ়া চাচা ছিল, সেই নাকি দেখেছিল, আপনা আঁখসে দেখেছিল, কিন্তু সে-চাচা বহুদিন হল মরে গেছে।"

"নোরবু-ভাইও দেখেনি? তা হলে ও টিজুতির পুতুল বানাচ্ছে কী করে?"

মিংমা হা-হা করে হেসে উঠল। সন্তু বিরক্ত হল একটু। এতে হাসির কী আছে—কোনো জিনিস না দেখলে কেউ তার পুতুল বানাতে পারে?

মিংমা বলল, "বহুত লোক আগে টিজুতিকা পুতুল বানিয়েছে, নোরবুও সেই দেখে বানাচ্ছে!"

সন্তু বলল, "আগে যারা বানিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ দেখেছে নিশ্চয়ই! কেউ না দেখলে এমনি-এমনি মন থেকে কেউ ওরকম অদ্ভুত মূর্তি বানায়?"

মিংমা বলল, "সন্তু সাব, কিতনা আদমি তো কার্তিক, গণেশ, লছমী মাইজির মূর্তি বানায়, তারা কি সেই সব দেবদেবীদের আঁখসে দেখেছে! গণেশজির যে হাত্তির মতন মাথা, ঐসা মাফিক কই কভি দেখা?"

কথাগুলো সন্তুর ঠিক পছন্দ হল না। আগেকার দিনে ঠাকুর-দেবতারা পৃথিবীতে নেমে আসতেন! তখন নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছে। তখন তারা মূর্তি গড়েছে, তাই দেখে-দেখে এখনকার লোকরা বানাচ্ছে।

কাকাবাবু যদি ইয়েতি আবিষ্কার করতে পারেন, তা হলে দারুণ ব্যাপার হবে। পৃথিবীতে এর আগে কেউ জ্যান্ত বা মরা কোনো ইয়েতির ছবি তুলতে পারেনি। সন্তুর কাছে ক্যামেরা আছে, সন্তু যদি কোনোক্রমে একটা ইয়েতির ছবি তুলতে পারে!

সন্তু মিংমাকে জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে তিব্বত কত দূরে বলতে পারো? এদিক দিয়ে তিব্বত যাওয়া যায়?"

মিংমা বলল, "হাঁ, কেন যাওয়া যাবে না? তুমলোক যিস রাস্তাসে আয়া, সেদিকে নামচে-বাজার আছে জানো? টাউন-মতন জায়গা!"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, জানি। নামচেবাজার তো সিয়াংবোচির আগে।"

"ওহি নামচেবাজারসে যদি বাঁয়া দিকে যাও, তারপর থামিচক বলে এক গাঁও পড়বে।

সেই গাঁও পার হয়ে যাও, উসকা বাদ বড়া-বড়া সব পাহাড়, সবসে বড়া পাহাড় কাংটেগা। কেন কাংটেগা নাম জানো? কাংটেগা মানে হল সফেদ ঘোড়া। ঠিক সাদা ঘোড়ার মতন দেখায় সে পাহাড়। ওহি দিকে আছে নাংপা পাস্। সেই নাংপা পাস্ দিয়ে চলে যাও, বাস, টিবেট পঁহুছে যাবে!"

সন্তু প্রায় লাফিয়ে উঠল। তা হলে তো টিনটিনের গল্পের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। নেপালের মধ্য দিয়েই তো টিনটিন আর ক্যাপ্টেন হ্যাডক গিয়েছিল তিব্বতে।

মিংমাকে আর কিছু না-বলে সন্তু ছুট দিল গম্বুজের দিকে। একটুখানি যেতে-না-যেতেই ধড়াস করে আছাড় খেল।

মিংমা এসে তার হাত ধরে তুলে একটু বকুনি দিয়ে বলল, "সন্তু সাব, কিতনা বার বোলা, বরফের ওপর দিয়ে একদম ছুটবে না! কভি নেহি! আইস্তে-আইস্তে চলতে হয়!"

সন্তু একটু লজ্জা পেয়ে গেছে। তবে একটা সুবিধে, এই বরফের ওপর জোরে আছাড় খেলেও গায়ে বেশি লাগে না।

কিন্তু সন্তু উৎসাহের চোটে আর স্থির থাকতে পারছে না। সাবধানে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে গম্বুজটার দিকে চলল।

কাকাবাবু পোশাক-টোশাক পরে তৈরি হয়ে তখন বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছেন। সন্তু ভেতরে ঢুকে দারুণ উত্তেজিতভাবে বলল, "কাকাবাবু, এবার আমরা ইয়েতির খোঁজে এসেছি, তাই না?"

কাকাবাবু সন্তুর মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর মুচকি হেসে শান্ত গলায় বললেন, "ইয়েতি বলে কিছু আছে নাকি?"

সন্তুর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ইয়েতি বলে কিছু নেই? কাকাবাবু ইয়েতির খোঁজে আসেননি?

আঙুল তুলে সে কাচের বাক্সটার দিকে দেখিয়ে বলল, "তা হলে দাঁতের মতন ওটা কী?"

কাকাবাবু বললেন, "ঐ দাঁতটা সম্পর্কে তোর খুব কৌতূহল আছে, তাই না? আচ্ছা, আমি ঘুরে আসি একটু। ফিরে এসে তোকে ঐ দাঁতটার ইতিহাস শোনাব!"

(ক্রমশ)

হযবরল'র দেশে

তোমরা প্রায় সবাই সুকুমার রায়ের হ য ব র ল পড়েছ। আর যারা পড়েছ তারা নিশ্চয়ই ব্যাকরণ শিং, কুচকুচে, উদো-বুধো, এবং এদের সঙ্গে অন্যদেরও ভুলতে পারোনি। কী না হয় বল হ য ব র ল'র দেশে?

অবশ্য অনেকের ধারণা, অদ্ভুত ঘটনা শুধু আজগুবি গল্পের বইতেই ঘটে। কেউ কি কখনো দেখেছে, একটা কাক উড়ে এসে বাড়ির উঠোনে বসে স্লেটে অঙ্ক কষছে! কিংবা, কেউ টিকটিকি পুষে সেগুলোকে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিচ্ছে!

তোমরা বিশ্বাস করবে কি না জানি না, আমরা কয়েকজন সেদিন চোখের সামনে এইসব ঘটনা দেখলাম। একটা লাল টুকটুকে রুমালকে বেড়াল হয়ে যেতে দেখে আমরা তো থ!

সবচেয়ে বেশি আলাপ হল হিজিবিজিবিজের সঙ্গে। তার সমস্যা হল, সে কিছুতেই হাসি সামলাতে পারে না।

সবচেয়ে জমেছিল বিচারের দৃশ্যটি। শজারু কেস করে দিল। উকিল শেয়াল আর কুমির। কিন্তু কোর্টের মধ্যে ব্যাঙের চলাফেরাই ছিল খুব জাঁকালো।

ঘটনাগুলো ঘটল সেদিন সকালবেলা রবীন্দ্রসদনে। কলকাতার পাঠভবন স্কুলের ছেলে-মেয়েরাই আয়োজন করে এই হ য ব র ল'র দেশে আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গেছল। বাইরে বেরিয়ে দেখি মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। পকেটে ছিল একটা লাল রুমাল। ভাবছি মাথায় বেঁধে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। এমন সময় পকেটের মধ্যে শুনলাম 'ম্যাঁও!'

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো নিমাই ঘোষ

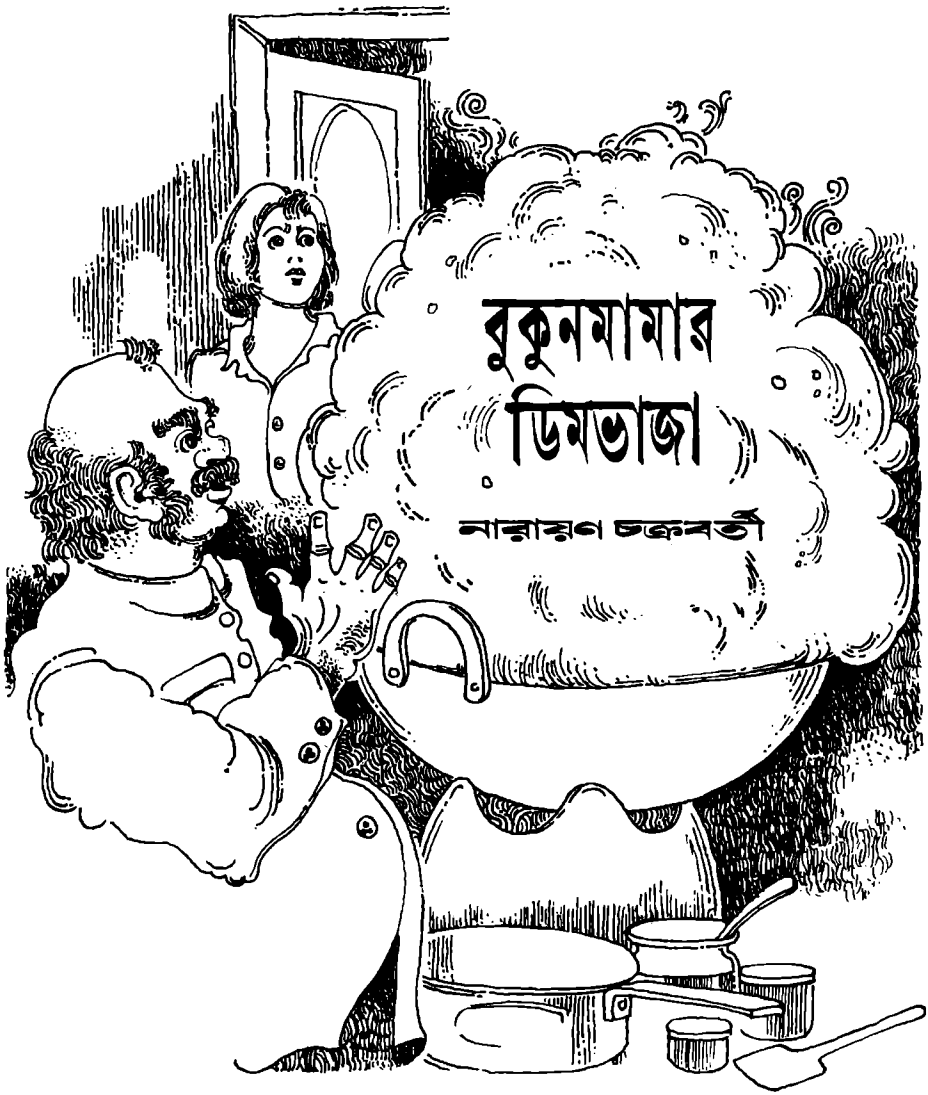

বুকুনমামার ডিমভাজা

নারায়ণ চক্রবর্তী

আমাদের বুকুনমামাকে চেনো তো? চেনো না? সে কী? পাড়ার পাইকারি মামা, সব্বাই চেনে। আচ্ছা আচ্ছা, অত মুষড়ে পড়তে হবে না—চিনিয়ে দিচ্ছি। গায়ে গলাবন্ধ কোট, পরনে পাজামা, পায়ে কুও ভেডিস জুতো। লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুট। গালে ইয়া গালপাট্টা দাড়ি, পুরুষ্টু এক জোড়া গোঁফ, ঘন ভুরু, খ্যাঁদা নাক, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। এই হলেন বুকুনমামা। রাজ্যের যত সব উদ্ভট চিন্তা তাঁর মাথায় ঘোরে সব সময়ে। ভারী খামখেয়ালি আর একবগ্‌গা মানুষ।

সে-দিন রান্নাঘরের গ্যাস-উনুনে সবে চায়ের জল চাপিয়েছি, হঠাৎ ঝড়ের বেগে বুকুনমামা এসে ঘরে ঢুকলেন, হাতে দুটি ডিম। এসেই হুকুম দিলেন, "কেত্‌লি নামা, ডিমভাজা খাব।"

বুকুনমামাকে চিনি তো? তাই বিনা বাক্যব্যয়ে কেতলি নামিয়ে দিলাম। মুখে উনুনের গনগনে আঁচ লাগল।

বুকুনমামা বললেন, "এ যে-সে ডিম নয়

রে, জেট প্লেনে এসেছে।''

হতবুদ্ধি হয়ে বললাম, ''জেট প্লেনে ডিম?''

''হ্যাঁ রে, আমার এক শিষ্য পাঠিয়েছে কামস্কাট্‌কা থেকে। অধিক ফুলনশীল ডিম।''

''অধিক ফুলনশীল না অধিক ফলনশীল মামা?''

''দূর বোকা, ভাজতে গেলে বেশি ফুলবে, তাই এর নাম অধিক ফুলনশীল।'' বলেই হাঁক দিলেন, ''যোগাড় দে, এক্ষুনি ভাজব।''

নুন, লঙ্কা, পেঁয়াজবাটা তো মজুত ছিলই, এগিয়ে দিলাম। বিশাল প্যানে ডিম দুটো ভেঙে চামচে দিয়ে ফেটাতে লাগলেন বুকুনমামা। দশটা ডিম ভাজা হতে পারে এমন পরিমাণ নুন, লঙ্কা, পেঁয়াজবাটা ঢেলে দিলেন প্যানে। আমি মানা করবার অবকাশই পেলাম না। এদিক-ওদিক চেয়ে বুকুনমামা বললেন, ''বেকিং পাউডার আছে রে? দিলে দিব্যি ফুলে ফেঁপে উঠবে ডিমভাজা।''

আগের দিনই বেকিং পাউডারের একটি ছোট কৌটো কিনেছিলাম। নীরবে তাক থেকে পেড়ে বুকুনমামার হাতে দিলাম। তিনি তার ঢাকনা খুলে আধ কৌটো বেকিং পাউডার ডিমের ওপর ঢেলে দিলেন, তারপর মনের আনন্দে চামচ দিয়ে ফেটাতে লাগলেন।

আমি দু'চোখ কপালে তুলে বললাম, ''এ কী করলে বুকুনমামা? সিকি চামচ দিলেও যে বেশি হয়ে যেত,—দুটি মাত্তর ডিম? আর তুমি কিনা আধ কৌটো—''

''মিছেই মেয়ে হয়ে জন্মেছিস সুষমা, জানিস না,—অধিকন্তু ন দোষায়। আরে এ হল গে অধিক ফুলনশীল ডিম। নে, ঘিয়ের কড়া চাপা, সব চেয়ে বড় কড়াটা চাপাবি।''

কী আর করি, বড় ঘিয়ের কড়াটা উনুনের ওপর চাপিয়ে আবার গ্যাস বাড়িয়ে দিলাম। ঘি গরম হতেই বুকুনমামা দুটি ডিমের ঐ অপরূপ মিশ্রণটুকু কড়ায় ঢেলে দিলেন। ছ্যাঁক করে একটা জোর শব্দ হল, ভাবলাম এটা বোধ হয় অধিক শব্দশীল ডিম।

কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল, তারপরেই আমার দুই চোখকে ছানাবড়া করে কামস্কাট্‌কার ডবল ডিমের ওমলেট চড়চড় করে ফুলে ফেঁপে কড়া ছাপিয়ে উঁচুতে উঠে গেল। তারপর পলকে পলকে বাড়তেই লাগল। এক ফুট ...দুই ফুট...তিন ফুট...বাড়ছে তো বাড়ছেই।

আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, ''ও বুকুনমামা, এ কী হল, এ যে থামছেই না—''

বুকুনমামাও ব্যাপার-স্যাপার দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ''তাই তো রে, একে অধিক ফুলনশীল, তাতে আবার বেকিং পাউডার, মাণ-কাঞ্চন যোগ হয়ে গেছে বোধহয়—''

ওদিকে ডবল ডিমের ওমলেট বেড়েই চলেছে, ছাত ছুঁয়ে ফেলে আর কী! হঠাৎ বুকুনমামার মাথা খুলে গেল, চেঁচিয়ে উঠলেন, ''ওরে পাশের বাড়ির নন্তু, সন্তু, ষণ্ডা, গণ্ডা, মণ্ডা, বিনু, মিনু, ছিনু, চিনুকে ডাক। খেয়ে খেয়ে কমিয়ে দে ওমলেটটার বাড়, নইলে নির্ঘাত ছাত ফাটিয়ে দেবে।''

দু'জনের চেঁচামেচিতে পাড়ার বাচ্চারা সব হাজির হল। মহা আনন্দে চামচ দিয়ে কেটে কেটে খেতে লাগল কামস্কাটকার অধিক ফুলনশীল ডবল ডিমের গরমা-গরম ওমলেট। আমি আর বুকুনমামাও হাত লাগালাম। ওমলেট যত বাড়ছে আমরা এগারো জন তার চেয়ে বেশি বেশি খেয়ে নিচ্ছি।

তাই সে-যাত্রায় রান্নাঘরের ছাত আর ফাটল না।

তবে হ্যাঁ, কামস্কাটকার অধিক ফুলনশীল ডবল ডিমের ওমলেট কিন্তু খেতে সত্যিই দারুণ।

ছবি অনুপ রায়

ট্রেনে যাত্রীদের মালপত্র রাখবার যে খুপরি, তার ভেতরে ছোট্ট ছাপাখানা বসিয়েছে ১৪ বছরের একটি ছেলে। লেডিস-রুমালের মাপে মিনি-খবরের-কাগজ ছেপে সে নিজেই যাত্রীদের কাছে বিক্রি করে। আর এ-কাজের ফাঁকে-ফাঁকে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে সে এক্সপেরিমেণ্ট করে নিজের খুপরিতে বসে। এতে তার দারুণ মজা লাগে। একদিন তো ফসফরাস নিয়ে কী একটা পরীক্ষা চালানোর সময় কামরায় আগুনই ধরে গেল। লোকজন ছুটে এসে আগুনটা নিভিয়ে ফেলল বটে, কিন্তু জিনিসপত্রসুদ্ধু ছেলেটাকেও নামিয়ে দিল ট্রেন থেকে। এই ছেলেটিই কিন্তু পরে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারক বলে নাম করেছিলেন। নাম তাঁর টমাস আলভা এডিসন।

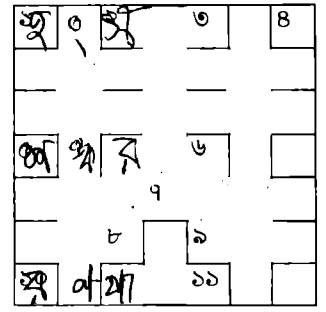

সংকেত : পাশাপাশি : (১) সরস্বতীর বাহন, তবে রাজহাঁস নয়। (৩) বিশেষ একটি খেলায় বিজয়ী দেশের সম্মান। (৫) শিবের এক নাম। (৬) দেবগায়ক। (৮) শামিয়ানা। (১০) বে-পা অস্বাভাবিক দ্রুত হাঁটতে পারে। (১১) রোগবিশেষ।

উপর-নীচ : (১) আসলে হ্রদ, কিন্তু সাগর নামে পরিচিত। (২) অত্যন্ত ভারী। (৩) খাওয়া ভাল, তবে অঙ্কে পাওয়া ভাল নয়। (৪) পশ্চিম গোলার্ধের বিস্তীর্ণ পাথুরে এলাকা। (৭) কাঠেরও হয়, আবার বন্দুকেরও থাকে। (৮) কোন্ ফুলের নামে কোনো-একটি ফলের বিশেষ প্রজাতি বোঝায়? (৯) উলটে নিলে শরীর।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

চা	ক	মা		ঘ	র্ঘ	রা
ণ		গা	জ	ন		না
ক্য	বা		য়		স	র
	স	মু	দ্র	গু	প্ত	
শু	ক		থ		মী	ন
শু		বা		গো		র্ম
ক	লা	পী		টে	নি	দা

ধাঁধা

শান্তনু ছেলেটি একেবারে চোখে-মুখে কথা বলে। আমার দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই। পড়াশুনায় যেমন চৌকস, খেলাধুলাতেও তেমনই উৎসাহী। যতক্ষণ ছিল, একটুক্ষণের জন্যও ছোট্‌কাকে চুপ করে থাকতে দেয়নি। নানান বিষয় নিয়ে অনর্গল কথা বলে গেছে। বহু খবর রাখে, ধাঁধার উত্তর দিতেও বেশি সময় নেয় না।

ছোট্‌কা যে ওকে—মানে শান্তনুকে—নানা ভাবে বাজিয়ে দেখছে আমি বুঝতে পারছিলাম। সব কথা শুনিনি, মানে একটু নীচে গিয়েছিলাম।

শান্তনুরা চলে যাবার পর ছোট্‌কা বলল, "শান্তনু আমায় দু চারটে ধাঁধা জিজ্ঞেস করে গেল। তারই থেকে তোকে ধাঁধা দেব এবার।"

"ও তোমাকে ধাঁধা জিজ্ঞেস করল?" আমি বেশ অবাক হয়েই প্রশ্ন করি ছোট্‌কাকে, "তুমিই যে ধাঁধা বানাও, আর ধাঁধা বানিয়ে লোককে বোকা বানাও, ও জানে না?"

একটু হেসে ছোট্‌কা বলল, "ঠিক ধাঁধা বলতে যা বোঝায়, তেমন টিপিক্যাল কিছু নয়। তবে ধাঁধার মতো করেই বলল। লিখে নে, তা হলেই বুঝতে পারবি।"

আমি লিখে নিলাম।

প্রথম ধাঁধা : জন্মদিনের টাকায় শান্তনু কিনেছিল একটা ব্যাট আর দুটো বল। দুটো বলের দাম পড়েছিল ব্যাটের দামের ঠিক অর্ধেক। দু-তিন দিন পরেই ওর ব্যাট-বলে অরুচি ধরে যায়। ব্যাট আর বল দুটো তখন ও এক বন্ধুকে বিক্রি করে দেয়।

ব্যাটের ক্ষেত্রে ও শতকরা কুড়ি টাকা লাভ করে, আর বল দুটো বিক্রি করে শতকরা কুড়ি টাকা লোকসানে। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখা গেল, ব্যাট আর বল দুটো বিক্রি করে শান্তনুর দু টাকা লাভই হয়েছে।

এ থেকে বলতে হবে, শান্তনু কত টাকায় নিজে ব্যাট কিনেছিল, একেকটা বলের জন্যই বা ওর কত টাকা লেগেছিল?

দ্বিতীয় ধাঁধা : ষোল টাকা নিয়ে বাজারে গেছ তুমি। মোট ষোলটা ফল কিনতে হবে। টাকায় চারটে করে কলা, আম টাকায় একটা, তরমুজ একটা চার টাকা। কোন্ ফল কটা করে কিনলে ষোল টাকা খরচ করে ষোলটা ফল কেনা যাবে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন টিয়া ওড়ে না, এমনকী খাঁচাতেও থাকে না?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ একই বাঘ বনের মধ্যে কতদূর ঢুকতে পারে?

গতবারের উত্তর ॥ ১। প্রথম সূত্র থেকে স্পষ্ট যে, একটি বইয়ের নাম 'মায়াবী মানুষ'। রাতের হায়না নামে কোনো বই নেই, (সূত্র ৩), তাহলে একটি বইয়ের নাম 'রাতের হানা-বাড়ি', আরেকটির নাম—'রহস্যময় হায়না' (সূত্র ২)। 'রক্তলোভী নিশাচর' বলে কোনো বই নেই (সূত্র ৩), তাহলে 'রক্তলোভী কাপালিক' একটি বইয়ের নাম, অন্য বইটির নাম 'গোপন নিশাচর'।

২। ছোট ছেলেটির বেশি শীত লাগবে। ৩। তুরঙ্গ, অন্যগুলি হাতির প্রতিশব্দ। ৪। ২২৪।

সত্যসন্ধ

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল হুঁকোর ছবি
ফোটো তপন দাস

উত্তর বটে

প্রঃ কারও গালদুটো যদি গোল গোল হয়তো ক্ষতি কী?
উঃ তা হলে খুব গণ্ডগোল।

প্রঃ এক গালে চড় খেলে কী করতে হয়?
উঃ অন্য গালটা দিয়ে চটপট সরে পড়তে হয়।

প্রঃ কোন্ পাখি বিপদে পড়লে বাবাকে না ডেকে বাবার ভাইকে ডাকে?
উঃ কাক।

প্রঃ পাঁচটা ভাত এক জায়গায় রাখলে কতগুলো হয়?
উঃ পঞ্চান্ন।

প্রঃ কার তিনটে হাত?
উঃ জ্যামিতির ত্রিভুজের।

প্রঃ ইতিহাসের কোন্ রাজার কথায় কোনো মাথামুণ্ডু নেই?
উঃ কণিষ্কের।

প্রঃ কোথাকার লোকেরা হেরে গিয়ে কাঁদে?
উঃ কান্দাহার-এর।

সুসেন

জন্মদিনে কিংবা অন্য কোনও উৎসবে, কি পিকনিকে, যখন অনেক লোক একসঙ্গে জড়ো হয়, তখন: কার জন্য একটা দারুণ মজার খেলা এবার শেখা যাক।

এ খেলার জন্য আগে থেকে একটু প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। খবরের কাগজ থেকে অথবা পাক্ষিক আনন্দমেলা থেকে কিছু-কিছু নাম করা লোকের ছবি কেটে রাখবে তুমি। নেতাদের ছবি, শিল্পীদের ছবি, খেলোয়াড়দের ছবি—এমন-সব। যত বেশী ছবি যোগাড় করতে পারবে খেলাটি তত বেশিক্ষণ ধরে চলবে আর মজাও জমবে তত বেশি।

কাটা ছবিগুলোর তলায় যদি ছাপানো নাম থেকে থাকে, অবশ্যই নামটা কেটে বাদ দিয়ে দেবে। এর পর তোমার কাজ হবে ছবিগুলোকে সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা। আরেকটা কাগজে চটপট করে উত্তর মেলাবার সুবিধের জন্য, ওই সংখ্যাগুলো পর পর লিখে নিজের কাছে রেখে দেবে। নিজের যদি সব ছবির নাম জানা থাকে তাহলে অবশ্য আরও ভাল, কাগজে লিখে রাখার দরকার হবে না।

একটা বড় বোর্ডে কিংবা খাতার ছবিগুলো আটকে রাখতে পারো। এক জনকে এক-একটা সংখ্যা দেখিয়ে প্রশ্ন করো, অমুক সংখ্যায় কার ছবি? তমুক সংখ্যায় কার ছবি?

দেখবে খুব চেনা লোকের ছবি নিয়েও কত মজার উত্তর আসে। কেউ বলবে, পেটে আসছে মুখে আসছে না, কেউ বলবে সম্পূর্ণ উল্টোপাল্টা নাম। হাসির হুল্লোড় উঠবে সে-সব উত্তরে।

দু-একজন নিশ্চিত ঠিকঠিক উত্তর দেবে। তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশি হবে না।

মজারু

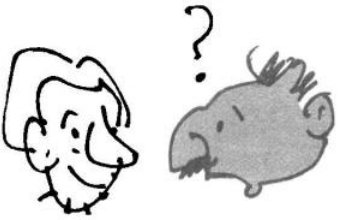

হরিবাবু রাজেনবাবুকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "সে কী মশায়, আমি যে শুনেছিলাম আপনি মারা গেছেন!"

রাজেনবাবু হেসে বললেন, "এখন আমাকে সামনা-সামনি দেখেও কি বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আমি জীবিত?"

হরিবাবু মাথা চুলকে বললেন, "কিন্তু যাঁর কাছে শুনেছিলাম, তিনি আপনার চেয়ে ঢের বেশি বিশ্বাসযোগ্য। তাঁর কথাই বা তুচ্ছ করি কী করে?"

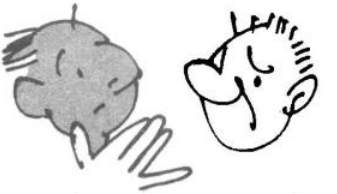

"তুমি কি ভুলে গেছ যে আমি তোমার কাছে দশটা টাকা পাই?"

বন্ধুর এই প্রশ্ন ঋণী বন্ধুটি জবাব দিলেন, "না, এখনো ভুলিনি, তবে যদি আরো কিছু সময় দাও, নিশ্চয়ই ভুলে যেতে পারব।"

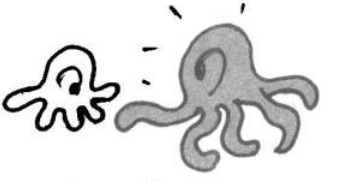

বাচ্চা অক্টোপাস কথা বলতে শিখে প্রথমেই মা-অক্টোপাসকে জিজ্ঞাসা করে, "মা, তুমি আমাকে বলে দাও, কোনগুলো আমার হাত, আর কোনগুলো আমার পা?"

ছবি অহিভূষণ মালিক

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ২৫ ॥

ফুটবল খেলায় যুদ্ধের পরিভাষা প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। যেমন—রক্ষণব্যূহ, আক্রমণ বাহিনী, ব্যাফল ওয়াল, ত্রিভুজ রক্ষণ, সাঁড়াশি আক্রমণ, অ্যাটাকিং লাইন, স্ট্রাইকিং জোন ইত্যাদি। আধুনিক ফুটবলে যুদ্ধের কৌশলও এসে গেছে অনেকদিন। এখনকার কোচদের মতে ওয়ার স্ট্রাটেজির সঙ্গে ফুটবল স্ট্রাটেজির পার্থক্য খুব সামান্যই। যুদ্ধের মতো ফুটবল খেলাতেও রক্ষণের বাঁধুনি বুঝে আক্রমণ শানানোর পরিকল্পনা নিতে হয়।

পূর্ব আফ্রিকায় ফুটবল সফরে গিয়ে কিন্তু আমরা বন্য পশুর মধ্যেও রণনীতির প্রমাণ পেয়েছিলুম। আগেই তো লিখেছি, নাইরোবির ন্যাশনাল পার্ক নামেই পার্ক। আসলে পঁচিশ মাইল লম্বা ও বারো মাইল চওড়া বিশাল এলাকা হরেক রকম হিংস্র প্রাণীর বাসভূমি। পার্কের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে শান-বাঁধানো রাস্তা। গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল, জলাশয় সর্বত্র। তার মাঝেই অসংখ্য বুনো জীবজন্তুর ডেরা। এখানে হরিণের পাল চরে বেড়াচ্ছে, ওখানে চরে বেড়াচ্ছে ডোরাকাটা জেব্রার দল। কোনোখানে লম্বা গলা উঁচু করে গাছের পাতা চিবোচ্ছে জিরাফ। কোথাও গণ্ডারের পাল, কোথাও বাইসন, জলে ঝাঁকে ঝাঁকে কুমির আর জলহস্তী।

আমরা গাড়িতে চেপে রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখি এক জায়গায় অনেকগুলো মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর, ওইসব গাড়ির যাত্রীরা ভেতর থেকে উঁকি মারছে একটা ঝোপের দিকে। ঝোপের মধ্যে টিলার উপর কেশর ফুলিয়ে বসে আছেন স্বয়ং পশু-রাজ। বিশাল চেহারা। বসার ভঙ্গি, ঘাড় ঘোরানো, তাকানো একেবারে রাজকীয়। পশু-রাজ আমাদের থেকে মোটে পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে বসে ছিল। তখনও সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসেনি। দেখতে দেখতেই ওই টিলার কাছে জড়ো হল আরও চারটি সিংহ। পাঁচটি মাথা প্রায় এক জায়গায় মিশে একটু নড়াচড়া করল। মনে হল ওরা যেন কী একটা ফন্দি আঁটছে। আমাদের দিকে তেড়ে আসবে না তো! না, আমাদের সম্পর্কে ওরা একেবারেই উদাসীন। দৃষ্টি ওদের দূরে, বহু দূরের এক পাল হরিণের দিকে। হরিণগুলো তৃণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছিল মনের আনন্দে। হঠাৎ মনে হল, ওরা সিংহের উপস্থিতির কথা টের পেয়ে গেছে। ভীত চোখে ওরা তাকাচ্ছিল এদিক-ওদিক। পাঁচটি সিংহ পাঁচদিক থেকে ঘিরে ফেলল হরিণগুলোকে। এটা ওদের রণকৌশল। একদিক থেকে আক্রমণ করলে হরিণের পাল ছুটে পালাবে আর একদিকে। তাই পাঁচদিক থেকে পালে হানা দেবার কৌশল। চোখের সামনে দেখলুম, টিলার উপর থেকে সিংহ-গুলোর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে হরিণগুলো বিদ্যুৎগতিতে ছুটে পালাল।

কিনিয়াতে অনেকগুলো ন্যাশনাল পার্ক আছে। লেক নাকুরু ন্যাশনাল পার্কের বিস্তৃতি বারো হাজার বর্গ-একর। সমুদ্র-পিঠ থেকে ছ' হাজার ফুট উপরে। পাশেই সোডিয়াম সল্ট লেক। নাকুরু বিশ্ববিখ্যাত পক্ষীনিবাস। প্রায় সাড়ে তিনশো জাতের হাজার হাজার পাখি আছে এখানে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। রিডার্স ডাইজেস্টে পড়েছি, আমরা ওখান থেকে চলে আসার পরে, ওই একষট্টি সালেই, মড়ক লেগে ওখানকার হাজার হাজার পাখি মারা গেছে।

পূর্ব-আফ্রিকা সফর সেরে আমরা গিয়ে-ছিলুম মরিসাসে। সম্ভবত অধিনায়ক বলেই আমাকে এয়ার ফ্রান্সের প্লেনে 'প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। মরিসাসের বেশির ভাগ মানুষই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তবে ফরাসি এবং ইংরেজ রক্তের লোকের সংখ্যাও কম নয়। ওদের বলা হয় 'ক্রিওল'। বিমানবন্দরে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ওই মাঝরাতেও বেশ ভিড় হয়েছিল। ভিড় ঠেলে আমাদের প্রত্যেকের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন এক ভদ্রলোক। পরে শুনলুম তিনি মরিসাসের পরিবহণ- মন্ত্রী শিউ রামগুলাম। এখন তিনি মরিসাসের প্রধানমন্ত্রী। রাম-গুলামের আগ্রহেই মরিসাস সফরের ব্যবস্থা হয়েছিল। ওখানে তিনটি ম্যাচের মধ্যে একটিতে

মরিসাসের পরিবহণমন্ত্রী (পরে প্রধানমন্ত্রী) শ্রীশিউ রামগুলামের সঙ্গে মোহনবাগান দল

আমরা জিতেছিলুম, হেরেছিলুম একটিতে, আর, একটি ম্যাচ ড্র হয়েছিল। মরিসাসের ফুটবলের মান তখন বেশ উন্নত ছিল।

আমি চিরদিন বিশ্বাস করি, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যত তীব্র হবে, খেলার মান তত বাড়বে। এবং ব্যক্তিগত দক্ষতাও বেড়ে যাবে সেই সঙ্গে। মরিসাসের ঘটনার কথাই বলছি।

পূর্ব-আফ্রিকায় দু-একটি খেলায় জারনেল সিংয়ের ভুলচুকে দলের মধ্যে কথা উঠেছিল। হয়তো সেই জন্যেই অভিমান করে জারনেল মরিসাসের কোনো ম্যাচে খেলতে চাইল না। আমরা অনেক অনুরোধ করেও তাকে রাজি করতে পারলুম না। তার এক কথা—"না, আমি খেলব না।" আমাদের দলে দ্বিতীয় কোনো স্টপার ছিল না। তখন বাধ্য হয়ে প্রথম ম্যাচে শুভাশিস গুহকে স্টপারে নামানো হল। আগে লিখতে ভুলে গেছি, শুভাশিস আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল পরে। তোমরা হয়তো অনেকে শুভাশিসের খেলা দেখেছ। দীর্ঘদেহী খেলোয়াড়। খেলতও খুব ভাল। কিন্তু পঞ্চান্নয় সফরকারী রুশ দলের সঙ্গে খেলা ছাড়া বেচারি আর কখনও ভারতীয় দলের জার্সি পরার সুযোগ পায়নি। হেড, কিক, অ্যান্টিসিপেশন, ট্যাকল—সবই ছিল শুভাশিসের। মরিসাসে প্রথম ম্যাচে অসাধারণ খেলেছিল। অত ভাল খেলবে আমরা কল্পনাই করতে পারিনি। ঠিক ছিল পরের ম্যাচেও শুভাশিস স্টপার হবে। কিন্তু খেলা শুরুর অনেক আগেই দেখি, বুট প্যান্ট পরে জারনেল প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। জারনেলই ওই ম্যাচে খেলেছিল এবং খেলেছিল জারনেল সিংয়েরই মতো। একেই বলে, হেলদি রাইভালরি। আমার নিজের খেলার কথায় শুধু বলব, মরিসাসের মানুষদের খুশি করতে পেরেছিলুম।

আমাদের বিদায়-অভিনন্দন জানানো হয়েছিল যথেষ্ট সমারোহের সঙ্গে। মরিসাস দ্বীপের অনেক ক্লাবই আমাকে তাদের 'লাইফ মেম্বার' করে নিয়েছিল। ডোডো ক্লাব উপহার দিয়েছিল একটি সুন্দর নেকটাই, যার উপরে ছিল ডোডো পাখির ছাপ।

ডোডো পাখি শুধু মরিসাস দ্বীপেই দেখা যেত। পৃথিবীর আর কোথাও আজ আর ওই পাখি নেই। নির্মূল হয়ে গেছে। ওই জন্যই ইংরেজ ফ্রেজটির উদ্ভব — "ডেড অ্যাজ ডোডো"।

ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানিতে কীভাবে চাকরি পেয়েছিলুম সে গল্প তোমাদের আগেই শুনিয়েছি। এবার শোনো স্টেট ব্যাঙ্কে অফিসার হয়ে ঢোকার বৃত্তান্ত।

আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন বলে বে-সরকারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে খুব একটা খুশি ছিলেন না। প্রায়ই বলতেন, "ওখানে চাকরি করে তুই কি খেলোয়াড় জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবি?"

সময় এখন অনেক বদলে গেছে। ভাল ফুটবলারদের সামনে এখন ভাল চাকরির অঢেল সুযোগ। তখন কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে ফুটবলারদের এত কদর ছিল না। কেউ কেউ অবশ্যই চাকরি জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

লাসা (তিব্বত) ১০ জুলাই

অভীক সরকার ও বরুণ সেনগুপ্ত প্রেরিত সংবাদ "অতীশের নাম তিব্বতীরা এখনও ভুলে যায় নি"—

আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ জুলাই।

এই অতীশ কে জানো? প্রায় হাজার বছর আগে এই বাঙালী পণ্ডিত বৌদ্ধ-শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য লাভ করে অনেক কষ্ট করে তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। চীন, নেপাল, যবদ্বীপ, গৌড়, মগধ রাজগণ তাঁকে সম্মান করতেন।

অতীশের সম্পূর্ণ জীবনী

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

মূল্য ৩·০০

লিখেছেন প্রবীণ লেখক

সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়

কিশোর উপন্যাস

প্যারাসুটে দোল খেতে খেতে প্যারাট্রুপার পার্থদা নেমে আসে মাটিতে। এই পার্থদাই একদিন সৌম্যদের পাঁচজনকে নিয়ে যায় তরাই এর ঘন অরণ্যে। উত্তেজনায় ভরে উঠা এ্যাডভেঞ্চার।

নির্মলেন্দু গৌতমের

সুন্দর দুর্গম ৪·০০

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

কিন্তু প্রথমে তাঁদের সাধারণ কর্মী হিসেবে ঢুকতে হয়েছিল।

এখন বহু বে-সরকারি শিল্প-সংস্থায় মাইনে এবং সুযোগ-সুবিধা সরকারি চাকুরে-দের চেয়ে অনেক বেশি। তখন কিন্তু এতটা ছিল না। একটা ভাল সরকারি চাকরি পেলেই বাবা-মা বেশি খুশি হতেন। তাই বাবাকে খুশি করার জন্য আমি একটা ভাল সরকারি চাকরির খোঁজে ছিলুম।

পূর্ব-আফ্রিকা থেকে ফিরে আসার পর খবর পেলুম, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কিছু টপ ক্লাস স্পোর্টসম্যানকে সরাসরি অফিসার পদে নিয়োগ করবে, যদি ওইসব স্পোর্টস-ম্যানের উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে। আরও খবর পেলুম, ইতিমধ্যেই দুজন ক্রিকেটার অফিসার হয়ে বোম্বাই অফিসে ঢুকেছেন। একজন নরি কন্ট্রাক্টর, অপরজন রামনাথ কেনি। ওই খবরে আমি বেশ উৎসাহ পেয়ে দেখা করলাম স্টেট ব্যাঙ্কের কলকাতা অফিসের কয়েকজন বড় অফিসারের সঙ্গে।

একজন অফিসার বললেন, "হ্যাঁ, কন্ট্রাক্টর ও কেনিকে নেওয়া হয়েছে। স্কিম আছে আরও কয়েকজন টেস্ট ক্রিকেটারকে নেওয়া হবে। কিন্তু ফুটবলারদের নেওয়ার কোনো স্কিমের কথা তো জানি না।"

আর একজন বড় বাঙালি অফিসার বললেন, "টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের যদি নেওয়া হয় তবে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে অলিম্পিক ফুটবল খেলোয়াড়দেরই বা নেওয়া হবে না কেন? আমরা বোম্বাই অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, তুমি পরে দেখা কোরো।"

বলা বাহুল্য, ওঁরাই লেখালেখি করে কল-কাতায় আমার ইণ্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এবং জানিয়ে দিয়েছিলেন, কল-কাতার ইণ্টারভিউয়ে পাস করতে পারলে বোম্বাইয়ে আবার ইণ্টারভিউ দিতে হবে। তবে প্রথমটায় উতরে গেলে পরেরটায় বিশেষ বেগ পেতে হবে না। নিয়মমাফিক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া শক্ত কোনো প্রশ্ন করবে না।

কলকাতায় ইণ্টারভিউ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন শিক্ষা-মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন। সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন বাঘা ব্যারিস্টার এবং ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরী। তিনিই প্রশ্ন

মোম্বাসার মেয়রের সঙ্গে চুনী করমর্দন করছেন

শুরু করলেন। আমি যেন সত্যিই বাঘের মুখে পড়েছিলুম। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। সব প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে না পেরে আমি কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। তখন আশার বাণী শোনালেন ডঃ সেন। বললেন, "হি ইজ এ ব্রাইট ইয়ংম্যান অ্যান্ড অলিম্পিক ফুটবলার। মনে হয় কাজ ভালই করবে।"

আর কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে হল না। ভাবলুম, প্রথম হার্ডলটা বোধহয় পার হতে পেরেছি। কয়েকদিন পরে চিঠি পেলুম, বোম্বাইয়ে ইন্টারভিউ দিতে হবে।

একষট্টির ফুটবল মরসুমের মধ্যেই ওই ইন্টারভিউ। তখন লীগে ফিরতি খেলা হত। খেলতে হত বেশি ম্যাচ। তাই সপ্তাহে তিনটি করে খেলা পড়ত। মোহনবাগান খেলত মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবারে। বোম্বাইয়ে ইন্টারভিউ ছিল শুক্রবারে। বৃহস্পতিবার খেলার পরই রাতের প্লেনে আমি যাত্রা করলুম। পরের দিন ইন্টারভিউ-কমিটির রুমে ঢুকেই দেখি গম্ভীরমুখ দশজন সদস্য বসে আছেন টেবিল ঘিরে। টেবিলের মাঝে কমিটির চেয়ারম্যান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর পি সি ভট্টাচার্য। নাম জিজ্ঞাসা করে তিনিই প্রশ্ন শুরু করলেন।

"আজ খবরের কাগজে তো দেখলুম কালকের খেলায় তুমি গোল করেছ। এত তাড়াতাড়ি বোম্বাইতে এলে কীভাবে?"

"খেলার পর রাতের প্লেনে।"

"কোথায় উঠেছ?"

"তাজমহল হোটেলে।"

"আবার কবে খেলা?"

"কালই।"

"তুমি তো সে-ম্যাচ খেলতে পারবে না। তাই না?"

"কেন পারব না। আজ ইন্টারভিউ হয়ে গেলে রাতের প্লেনেই কলকাতায় ফিরব। কাল খেলব।"

এই উত্তরের পরই এক সদস্য আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে যা বললেন তার বাংলা অর্থ—"তুমি প্লেনে এসেছ, 'তাজে' উঠেছ, আবার প্লেনেই ফিরে যাচ্ছ। তোমার তো টাকা-পয়সার অভাব নেই। তোমার চাকরির কী দরকার?"

ব্যাপারটা হঠাৎই কেমন যেন ঘোরালো হয়ে উঠল। আমি শুনেছিলুম শুধু নিয়মমাফিক কিছু প্রশ্ন করা হবে। এটাও হয়তো নিয়মমাফিক প্রশ্ন। কিন্তু আমার উত্তরে একটু গোলমাল হয়ে গেল। কেন ওভাবে উত্তর দিয়েছিলুম জানো? বাবা বলে দিয়েছিলেন। বন্ধু বান্ধবরাও পরামর্শ দিয়েছিল—খুব স্মার্ট হয়ে কমিটির সামনে যাবি, চটপট প্রশ্নের উত্তর দিবি, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং প্রশ্নের উত্তরে কোনোরকম দৈন্য যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে। তাই আত্মবিশ্বাস নিয়ে এবং একটু বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে প্লেনে যাওয়া এবং 'তাজে'

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কিশোর-কাহিনী

● বিশ্বের বিখ্যাত অনেক কিশোর উপন্যাস ● ছোটদের সব রকমের সব স্বাদের সেরা গল্প—ভূতের, হাসির, গোয়েন্দা, অ্যাডভেঞ্চার ● সত্যি শিকার-কাহিনী, ভৌগোলিক অভিযান, ডাকাতির কথা, যুদ্ধক্ষেত্রের গল্প, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী ● দেশ বিদেশের পৌরাণিক কাহিনী, লোক-গল্প ও রূপকথা ● ঈশপ-ক্রিলভ-পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিগল্প, পশুপাখির অন্যান্য গল্প, ● মহাকাব্য ও প্রাচীন কাব্যের গল্প, যেমন—ইলিয়াড, ওডেসি, বিওউলফ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সাগা, শাহনামা, ইগর সাগা, ভারতীয় মহাকাব্যের গল্প, বাই-বেলের গল্প ● সেক্সপীয়র ও কালি-দাসের নাটকের গল্প ● আরব্য রজনী ও কথাসরিৎসাগরের কাহিনী।

প্রতি খণ্ডের গ্রাহক-মূল্য ২০ ০০। গ্রাহক-চাঁদা ১০·০০। গ্রাহক-চাঁদা শেষ খণ্ডের মূল্য থেকে বাদ যাবে। এককালীন গ্রাহক-মূল্য ২০০·০০ টাকা। ডাকে বই নিলে আলাদা ডাকমাশুল। এককালীন গ্রাহকের প্রতি খণ্ডের জন্য ৩·০০ টাকা করে ডাকমাশুল। টাকা নিজে এসে, মানি অর্ডারে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে (চেকে নয়) দিতে হবে। প্রতি খণ্ডে প্রায় ৫০টি ছবি—ভালো কাগজ, ভালো বাঁধাই। গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে। শেষ তারিখ : ১৫. ৯. ৭৯ ১ম খণ্ড পূজার আগে বেরুবে।

গ্রন্থনিলয়

৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯

ওঠার কথা বলেছিলাম। তাজের নাম শুনেছ তো! বিখ্যাত পাঁচ-তারা হোটেল। আরব সাগরের তীরে।

আমার একটা গল্প জানা ছিল। মোরগ চুরির মামলার গল্প। উকিল সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি বলছ, তুমি চুরি করতে দেখেছ। আচ্ছা বল তো, মোরগটা কত বড় ছিল? সাক্ষী তাঁর বুকের কাছাকাছি ডান হাতখানা বাড়িয়ে বললেন—এত বড়। অর্থাৎ মাটি থেকে তাঁর হাত সমান উঁচু মোরগ। হাকিম এবার সাক্ষীকে বললেন—মোরগ কি অত বড় হয়? সাক্ষী তখন বললেন—হুজুর, আমি তো এক হাত দেখিয়েছি, আর এক হাত তো বেরই করিনি। এই বলে সাক্ষী তাঁর বাঁ হাতখানা ডান হাতের নীচে ইঞ্চি দশেক ব্যবধানে রেখে বলল—মোরগটা ছিল এত বড়।

কমিটির সদস্য আমাকে বলেছিলেন—"তোমার তো টাকা পয়সার অভাব নেই। তোমার চাকরির কী দরকার?"

তাঁর কথার উত্তর দেওয়ার জন্যে আমি ওই সাক্ষীর পন্থা অবলম্বন করলুম। বললুম, "স্যার, আমি সাধারণ ঘরের ছেলে। আমাকে কিছুই খরচ করতে হয়নি। আমার ক্লাবই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কোথায় উঠব তাও বলে দিয়েছে।"

চেয়ারম্যান পি সি ভট্টাচার্য এবং কয়েকজন সদস্যের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল। আমাকে আর কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে হল না। কলকাতায় ফিরে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই পেয়ে গেলুম অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। আমি সরাসরি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসারের চাকরিতে ঢুকে পড়লুম। ফুট-বলারদের মধ্যে এ চাকরিতে আমিই প্রথম। আগে কর্মী হয়ে ঢুকে পরে অনেকে অফিসার হয়েছেন। আমার পরে সরাসরি অফিসার হয়ে ঢুকেছেন দু'একজন ফুটবলার। ক্রিকেটারদের মধ্যে ঢুকেছেন অজিত ওয়াড়েকর, বিষেণ সিং বেদী, বিজয় মেহরা, হনুমন্ত সিং এবং আরও কয়েকজন। অফিসার হয়ে সরাসরি স্টেট ব্যাঙ্কে ঢোকার জন্যে যাঁরা খেলোয়াড়দের দরজা খুলে দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে সবাই কৃতজ্ঞ। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ কলকাতা অফিসের সেই সব বাঙালি অফিসারের কাছে, যাঁরা বাংলার ফুটবলারদের জন্য পথ খুলে দিয়েছিলেন।

(ক্রমশ)

রাত্রির যাত্রী

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

বিমল চক্রবর্তী থিয়েটারের মহলা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। মহলা বসে গৈপুরের মিত্তিরপাড়ায়। তাঁর বাড়ি পাশের গ্রাম

ইছাপুর। এখন দু গাঁয়ের মধ্যে পিচের রাস্তা হয়ে গেছে। দুপাশে বাড়িঘর উঠেছে। কিন্তু যে সময়কার কথা বলছি তখন ধুলোভরা মেঠো রাস্তা। দুদিকে বনশিউলি আর আশ-শেওড়ার জঙ্গল। সবে দেশ ভাগ হয়েছে। কিছু কিছু উদ্বাস্তু পরিবার এসে জঙ্গল সাফ করে ঘরবাড়ি করতে শুরু করেছে।

পুজোর আর দেরি নেই। দেবীপক্ষ পড়ে গেছে। পুজোর তিনদিন থিয়েটার। তিনটি নাটকেই বিমল চক্রবর্তীর বড় পার্ট। ভাল নাটক করেন বলে আশপাশের গ্রামে তাঁর খুব নামডাক। মনে মনে গর্বও আছে তাঁর। এমনিতেই ভয়-ডর কম। লম্বা-চওড়া চেহারা। ইয়া বুকের ছাতি। বেছে বেছে পার্টও করেন তেমন : বঙ্গে বর্গীতে ভাস্কর পণ্ডিত দুর্গাদাসে দুর্গাদাস, টিপু সুলতানে মাঁসিয়ে লালি।

মহলা শেষ হতে ইদানীং একটু বেশি রাত হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই গ্রামের লোকেরা সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। তার ওপর বিমল চক্রবর্তী যখন বাড়ি ফেরেন তখন নিশুতি রাত। চোর ডাকাত ভূত কাউকেই ভয় করেন না। তবে সাপ আর বুনো শুয়োরের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য হাতে একটি লাঠি আর পাঁচ ব্যাটারির টর্চ নিয়ে চলেন। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কখনও কখনও গুনগুন করে গান গান। মাইল দুয়েকের মতো রাস্তা এইভাবে চলে যান।

অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু বেশি রাত হয়ে গেছে। তৃতীয়ার চাঁদ সন্ধের দিকে উঠে কিছুক্ষণের জন্য ফিকে আলো দিয়ে আবার ডুবে গেছে। সারা পথে ঘুটঘুট্টি অন্ধ-কার। বিমল চক্রবর্তী লাঠি ঠুক-ঠুক করে এগিয়ে চলেছেন আর ভাস্কর পণ্ডিতের পার্টের কথা ভাবছেন।

হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে গোটা দুয়েক

শেয়াল ডেকে উঠল—হুক্কা-হুয়া। সঙ্গে সঙ্গে দিক্‌বিদিক কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনি উঠল—হুয়া হুয়া। দুনিয়ার সব শেয়াল একসঙ্গে ডাকছে। দুটো শেয়াল তাঁর সামনে দিয়েই ছুটে গেল। বিমল চক্রবর্তী টর্চের আলো ফেলতেই শেয়াল দুটোর চোখ ঝকঝক করে উঠল। লাঠি উঁচিয়ে সামনে তেড়ে যেতেই তারা পালিয়ে গেল সামনের ঝোপে। হঠাৎ বিমল চক্রবর্তীর মনে হল, কী একটা বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে। কিন্তু গন্ধটা কোথা থেকে আসছে ধরতে পারলেন না। ভাবলেন ঝোপের ভেতর হয়তো কোনো কুকুর-টুকুর মরে পড়ে থাকবে। পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকে চাপা দিলেন তিনি।

হঠাৎ টর্চের আলো ফেলতেই দেখলেন একশো গজ দূরে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। রোগা, লম্বা আধা বয়সী একটি লোক। খালি পা। পরনে আধময়লা খাটো ধুতি। খালি গা। পিঠের ওপরে ফেলা খেপলা জাল। ডান-হাত দিয়ে মুঠো করে ধরা। বাঁ হাতে ধরা একটি লাঠি।

লোকটি যেন ভুঁই ফুঁড়ে বেরুল। এই তো কিছুক্ষণ আগে টর্চের আলো সামনে অনেক দূর পর্যন্ত ফেলেছিলেন, কই তখন তো কাউকে দেখতে পাননি। বিমল চক্রবর্তী হাঁক পাড়লেন, "এই, কে রে তুই?"

লোকটি কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। বিমল চক্রবর্তী কাছে আসতেই বলল, "পেন্নাম। আমারে চেনবেন না। আমার নাম করালী। খালধারে থাকি।"

"এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস?"

"মল্লিকপুরের ঘাটে। এ-সময়টায় যমুনোয় খয়রা মাছ ওটে।"

"এত রাতে?"

"আজ্ঞে, আমরা জেলে লোক। রাতবিরেতে তো আমাদের কাজ বাবু।"

চেহারা দেখে বিমল চক্রবর্তীর কোনো সন্দেহ রইল না। লোকটি খাঁটি জেলে। চোর-ডাকাত নয়। মল্লিকপুরের ঘাট তাঁর বাড়ি থেকে আধমাইলের মতো পথ। যাক এতটা পথ তবু একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। লোকটি বলল, "আপনি আগে আগে আলো ফেলে যান কর্তা, আমি আপনার পিছনে আছি।"

বিমলবাবু গল্প করতে করতে পথ চলতে লাগলেন। করালী বলল, তাদের বাড়ি ছিল নড়ারন। যশোর জেলার এই গ্রাম থেকে বছর-খানেক হল এখানে এসেছে। বাড়িতে বউ আর দুই ছেলেমেয়ে আছে। যমুনা নদীতে মাছ ধরে গোবরডাঙ্গা বাজারে রোজ সকালে মাছ বিক্রি করে। সারারাত মাছ ধরে। দুপুরে ঘুমোয়। করালী বিমলবাবুকে ভাল করে চেনে। বিমলবাবু যে ভাল নাটক করেন তাও জানে। তবে কোনো নাটক সে দেখেনি। করালীর কথাগুলো পেছন থেকে ভেসে আসছিল। কিন্তু কোনো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। একটা লোক পিছন পিছন আসছে, তার কথা শোনা যাচ্ছে অথচ তার পায়ের শব্দ নেই। এক সময় বিমলবাবুর মনে হল, করালী বোধহয় পিছিয়ে পড়েছে। পিছনে ফিরে তাকিয়ে তিনি দেখেন সত্যিই কেউ নেই। আবার টর্চ জ্বালতেই দেখলেন এই তো করালী তাঁর থেকে মাত্র দু গজ পিছনে।

বিমলবাবু বললেন, "তুই কোথায় ছিলি?"

করালী বলল, "কেন কর্তা, আমি তো আপনার সাথে সাথেই আসতিছি।"

বিমলবাবু ভাবলেন, তাই হয়তো হবে। তাঁরই দেখার ভুল। নাঃ, বয়স হচ্ছে, এবার হাবড়ায় গিয়ে চোখের ডাক্তারকে দেখিয়ে আসবেন।

পরদিনও খাল পার হয়ে বটগাছের কাছে আসতেই করালীর সঙ্গে দেখা হল বিমলবাবুর।

"কী রে, আজও দেখা হয়ে গেল যে।"

"হ্যাঁ, কর্তা, এই সময়ই যে আমি রোজ যাই।"

"কাল কী-রকম মাছ পেলি?"

"অতি সামান্য। বর্ষার জল না পেলি তেমন মাছ ওঠে না—পাঁক ঘাঁটাই সার।"

আজও ঠিক তেমনি খটকা লাগল বিমল-বাবুর। করালীর হাঁটাটা যেন কেমন-কেমন। যেন কেউ মেঘের উপর দিয়ে আলতো ভাবে হেঁটে যাচ্ছে। ভাল করে টর্চ ফেলে করালীকে দেখে নিলেন বিমলবাবু। কী রোগা লোকটা। মুখটাও কী সরু! একেবারে যেন ছোট্ট একটা ঝুনো নারকোলের খোল। মুখে টর্চের আলো ফেলতেই করালী যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

বিমলবাবু বললেন, "কী হয়েছে?"

করালী বলে উঠল, "চোখে বাতি ফেললি চোখ জ্বালা করে।" বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল। বিমলবাবু অবাক হয়ে ভাবলেন, লোকটা এমন বেয়াদপের মতো হাসে। আর হাসিটাও কী বিশ্রী।

এর পর আর দুদিন পর-পর দেখা হয়ে গেল করালীর সঙ্গে। প্রতিবারই দেখা হয় ওই একই জায়গায়। আর প্রতিদিন যে বিমলবাবু একই সময় ফেরেন তাও নয়। যেমন আজ ষষ্ঠীর দিন ফুল রিহার্সাল ছিল বলে ফিরতে রাত একটা হয়ে গেল, অন্যদিন এগারোটা হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই, এত রাতেও ঠিক ওই একই জায়গায় দেখা হয়ে গেল করালীর সঙ্গে। বিমলবাবু অবাক হয়ে বললেন, "তোমার সঙ্গে দেখছি রোজই দেখা হয়ে যাচ্ছে। তোমার কী ব্যাপার বল তো বাপু? যখনই যে সময় ফিরি তোমার সঙ্গে দেখা হয়!"

করালী হেসে জবাব দিল, "আমার মাথায় টনক আছে কর্তা। আপনে যখন আসেন তখনই টের পাই।"

বিমলবাবু বলেন, "তাই দেখছি।"

করালী বলে, "কাল আসছেন তো কর্তা?"

বিমলবাবু বলেন, "না হে। কাল থেকে তো থিয়েটার আরম্ভ হচ্ছে। রাতগুলো গৈপুরেই কাটাব। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তুমি বরং পারলে থিয়েটার দেখে যেও। আমার পার্ট কেমন লাগল জানিও।"

করালী বলল, "ইর পরে আবার আপনাদের পালা কবে আছে? ইছাপুরে হবে না?"

বিমলবাবু বললেন, "বঙ্গে বর্গীটা কালীপুজোর সময় করতে বলছিল। কিন্তু আমি থাকতে পারব না। আমি লক্ষ্মীপুজোর পর বেড়াতে বেরুচ্ছি। পাটনা-রাজগীর হয়ে গয়া যাব। বাবার পিণ্ডিটা এবার দিয়ে আসব।"

হঠাৎ করালী আরও কাছে এগিয়ে এল। বিমলবাবু নাকের কাছে একটা বিশ্রী গন্ধ পেলেন। গন্ধটা আসছে করালীর গা থেকে। বোধ হয় আঁশটে গন্ধ।

করালী বলল, "গয়া যাচ্ছেন?"

বিমলবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তাই তো যাবার ইচ্ছে।"

"কবে গয়া যাচ্ছেন?"

কালীপুজোর দিন ওখানে থাকার ইচ্ছে আছে। অমাবস্যার দিনে পিণ্ডদান করব। কেন, তুমি একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?"

করালী বলল, "আপনি যদি যান তাহলে আমিও যাই। আমার বাবার কাজটাও সারে ফেলি।"

বিমলবাবু কথাটা শুনে প্রসন্ন হতে পারলেন না। উটকো একটা লোক। চাল-চুলো নেই। যা চেহারা আর পরিচয় পেয়েছেন এই কদিনে তাতে গয়া পর্যন্ত যাবার খরচ আছে কি না সন্দেহ। বুঝলেন সুযোগ বুঝে ঘাড়ে চাপতে চায়। আর সঙ্গী হিসেবেও লোকটি মোটেই সুখপ্রদ নয়। বিমলবাবু বললেন, "গয়া যাবার খরচ কিন্তু অনেক।"

করালী বলল, "টাকা যা লাগে আমি দেব কর্তা।"

বিমলবাবু বললেন, "তা যেতে পার। এখান থেকে শিয়ালদা। সেখান থেকে পাঠান-কোটে চাপবে। আমি তো অনেক ঘুরতে

ঘুরতে যাচ্ছি কিনা।" বিমলবাবু বেশ সন্ত্রস্ত হয়েই কথাটা বললেন।

লোকটি আবার তেমন বিশ্রী ভাবে হেসে উঠল। তারপর বলল, "কালীপুজোর দিন আমি নিজেই গিয়ে হাজির হব কর্তা। আপনি শুধু আমায় একটু সাহায্য করবেন তা হলিই হবে। বিদেশে আপনজনের সাহায্য ছাড়া তো যাতি পারি না।"

এড়াবার জন্য বিমলবাবু বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে!"

পাটনা রাজগীর নালন্দা ঘুরে বিমলবাবু তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে শংকরকে নিয়ে কালীপুজোর আগের দিন গয়ায় হাজির হলেন। গয়ায় বাবার কাজ করেই তাঁরা কলকাতায় ফিরে যাবেন।

পরদিন সকালে সাইকেল রিকশায় করে যেতে যেতে হঠাৎ বিমলবাবুর করালীর কথা মনে পড়ে গেল। করালী আসবে বলেছিল। কিন্তু আবার ভাবলেন, পাগলের খেয়াল। গয়া কি একটুখানি রাস্তা! আর তা ছাড়া বিমলবাবু কোথায় উঠেছেন না উঠেছেন তা করালী জানবে কী করে। কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই লোকটার।

স্ত্রী বললেন, "এদিক-ওদিক কেন তাকাচ্ছ?"

"না। একটা লোক আসবে বলেছিল।"

"কে বল তো—পাণ্ডা?"

"না, সে তুমি চিনবে না। আমাদের ইছুপুরের লোক।"

কিন্তু মন্দিরের দিকে যেতে যেতে বিমলবাবুর যেন কেন মনে হতে লাগল করালী আসবে, করালী আসবে। মন্দিরের কাছেই পাণ্ডা এসে ধরল। পাণ্ডার নাম শিউপ্রসাদ। পাণ্ডা প্রথমে মন্দিরে নিয়ে গেল। বাইরে থেকে পাদপদ্ম দর্শন করে নিয়ে বিমলবাবু মাথা মোড়ালেন। তারপর স্নান করে ফল্গুনদীর বিস্তীর্ণ বালুর উপর বসে পিতৃপুরুষের তর্পণ করলেন। তর্পণের পর পিণ্ডদান করলেন। ওঁর স্ত্রী আর ছেলে সে সময় মন্দিরে দাঁড়িয়ে। পিণ্ডদান করে সবে উঠেছেন এমন সময় সামনে তাকাতেই চমকে উঠলেন বিমলবাবু। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে করালী। করালীর গায়ে সাদা চাদর। পরনে সেই ধুতি। কিন্তু তার পিঠে ফেলা তেমনই একটি খেপলা জাল। লোকটা কি পাগল—জাল কাঁধে করে এত দূর চলে এসেছে।

"করালী তুমি? কখন এলে?" বিমলবাবু প্রশ্ন করলেন।

করালী বলল, "এই মাত্তর, আপনারে কয়েছিলাম—আসব। খুঁজতি খুঁজতি ঠিক ধরে ফেলেছি।"

"জাল নিয়ে এসেছ কেন? এখানেও কি মাছ ধরবে নাকি?"

"ওটা অভ্যেস হয়ে গেছে কর্তা। জাল আর জল ছাড়া চলতি পারিনে। আপনার কাছে একটা অনুরোধ কর্তা, আমার পয়সাকড়ি নেই। আমার বাপের নামে যদি একটা পিণ্ডি দিয়ে দেন পাণ্ডাজিরে বলে। বাপ বড় কষ্ট পাচ্ছে। পেরেতলোকে বড় কষ্ট কর্তা।"

ফল্গুনদীর বিস্তীর্ণ চরে শত শত লোক পিণ্ডি দিচ্ছে। সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। বিমলবাবুও এইমাত্র পিতৃতর্পণ করে উঠলেন। পিণ্ডদানও শেষ হয়েছে তাঁর। পুন্নাম নরক থেকে তাঁর পিতা উদ্ধার পেয়েছেন। ছেলের কর্তব্য সমাধা করলেন এতদিন পরে। মনটা তাই প্রসন্ন। তাই তিনি বললেন, "ঠিক আছে। পাণ্ডাজি, আর একটা পিণ্ডদান হবে। এই করালী আমার দেশের লোক আছে। এর বাবার নামে একটা পিণ্ড তৈরি করুন।"

নতুন করে আবার সব ব্যবস্থা হল। করালীকে পাণ্ডা জিজ্ঞেস করল. "আপনার পিতাজির নাম কী আছে?"

"করালীচরণ দাস।" করালী উত্তর দিল।

বিমলবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম জিজ্ঞেস করছে না—তোমার বাবার নাম?"

"ওই তো বললাম। করালীচরণ দাস।"

"তোমার নামও যা তোমার বাবার নামও তাই?" বিমলবাবু এবার একটু রেগে গেলেন।

করালী এবার বেশ রাগ করে জবাব দিল. "বলছি তো এক নাম।"

পাণ্ডা করালী দাসের নামেই পিণ্ড উৎসর্গ করল। উৎসর্গের শেষে পিণ্ড জলে ভাসাবার জন্য নিয়ে গেল করালীচরণ।

পাণ্ডা শিউরতন বলল, "আপনার খুব জান-পহচান আদমি বুঝি?"

বিমলবাবু বললেন, "না. মানে তেমন কিছু নয়।"

শিউরতন বলল, "যখন মন্ত্র পড়ছিলাম তখন ওর চোখ দুটো জ্বলছিল—ওঃ, কী ভয়ানক চোখ!"

এর মধ্যে বিমলবাবুর ছেলে ও স্ত্রী ফিরে এল। বিমলবাবুর ছেলে শংকর বলল, "কার কথা বলছেন পান্ডাজি?"

"বাবুজির দেশের একটি লোক পিন্ডি দিতে এসেছিল।"

"দেশের লোক! কে বাবা?" শংকর জিজ্ঞেস করল।

বিমলবাবু বললেন, "তোদের বলা হয়নি। থিয়েটারের মহলা দিয়ে ফেরার সময় রোজ রাতে ইছুপুরের রাস্তায় করালী দাস বলে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হত। লোকটি ওই সময় মাছ ধরতে যেত। ওই লোকটি আমায় বলেছিল পিন্ডি দিতে গয়ায় আসবে।"

"কার পিন্ডি?"

"তার বাবার—আশ্চর্য তার নামও করালী দাস।"

"লোকটা কী-রকম দেখতে বল তো? রোগা লম্বা মতো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ তুই চিনিস?"

শংকরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বলল, "তুমি বলছ কী বাবা? ওই করালী দাস তো এক বছর আগে যমুনায় মাছ ধরতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যায়। তুমি সে সময় গ্রামে ছিলে না। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। বর্ষাকালে জলের তোড়ের মুখে পড়ে যায়, আর উঠতে পারে না। গাইঘাটা পুলের কাছে ডেড বডি পাওয়া গিয়েছিল।"

বিমলবাবু বলে উঠলেন, "হতেই পারে না। জলজ্যান্ত লোক। এইমাত্র সে এখানে ছিল। যে মারা গেছে সে হয়তো তার বাবা।"

"যে মারা গেছে ভাল করে জানি সেই-ই করালী দাস। তার ছেলেপুলে ছিল না। তার বউকে আমি দেখেছি। তুমি বললেই হবে।"

বিমলবাবু বললেন, "বেশ চল তোকে দেখাচ্ছি। ওই তো করালী ওই দিকেই গেছে।"

তখন বাপ ছেলেকে নিয়ে বিস্তীর্ণ বালুভূমিতে করালীর সন্ধানে বার হলেন। ফল্গু-নদীর তীর জনাকীর্ণ। চারদিক খুঁজে কোথাও করালীকে পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে বোধিগয়ার দিকে আর একটু এগিয়ে যেতে বিমলবাবু হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন,

"আরে ওই তো করালী যাচ্ছে।"

শংকর লক্ষ করল, প্রায় দুশো গজ দূর দিয়ে রোগামতো একটি লোক হেঁটে যাচ্ছে হনহন করে। তার গা সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। বাঁ কাঁধে ফেলা একটি জাল। লোকটি ডান হাত দিয়ে কী যেন খেতে খেতে যাচ্ছে।

বিমলবাবু চিৎকার করে উঠলেন, "করালী—ক-রা-লী।"

আশ্চর্য! করালী থামল না। বরং চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

বিমলবাবু বললেন, "শংকর, ছুট লাগা ওকে ধরতেই হবে।"

তখন দুজনেই ছুটতে লাগলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! করালীকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। যতই ছুটছে ততই মনে হচ্ছে, করালী সেই একই দূরত্বে হেঁটে চলেছে।

বিমলবাবু ও শংকর তার পিছনে পিছনে ছুটছেন। পড়ন্ত বেলায় ফাঁকা বিস্তীর্ণ নদী-তীরে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া হু-হু করে বয়ে চলেছে। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে ওঁরা বালুর উপর বসে পড়লেন। প্রচন্ড পিপাসায় দুজনেরই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

সেই অবস্থায় দুজনেই দেখতে পেলেন একটা সাদা ছায়ামূর্তি অনেক দূরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সেই মুহূর্তে ওদের দুজনের সারা শরীর এক অজানা আতঙ্কে শিরশির করে উঠল। ওদের অচৈতন্য দেহ ফল্গুর ধু-ধু বালুভূমির উপর লুটিয়ে পড়ল।

ছবি দেবাশিস দেব

মা বলেছে তোর খেলনা-বাড়ির কাচের টুকরো গুছিয়ে রাখতে হবে। আমি তোকে সাহায্য করব!

আয় দেখি এ থলের মধ্যে কে কটা টুকরো ছুঁড়ে মারতে পারি!

আমি মারলুস! এবার তোর পালা!

বা: তোরটাও দিব্যি থলের মধ্যে ঢুকে গেছে!

আমি ঢুকিয়েছি সাতচল্লিশটা! তুই ঢুকিয়েছিস বাইশটা!

আয় আবার নতুন করে খেলব!
2-25

(বাঘা-১ ষাটের পাতায়)

(গাবলু-২ একষট্টির পাতায়)

উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা

কুন্তক

তাহলে তুমি বলছ যে মতো-কথা সবাই বলে?

বলছি।

তাহলে তুমি বলছ যে মতো-কথা মোটেই শক্ত নয়, বেশ সোজা কথা?

অনেক সময়েই তাই। তার মানে এ নয় যে সব সময়েই সোজা। শক্তও হয় কখনো কখনো।

মেলাতে গেলে বাদও দিতে হয়, যোগও দিতে হয়, এও তো বলছ তুমি?

বলছি তো।

আর কী বলছ বলো তো? ও, হ্যাঁ, আর বলছ যে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যেই মতো-কথা বলে লোকে।

তাই বলেছি বুঝি?

যাঃ, বলোনি? সেই যে কচি কলাপাতা

হ্যাঁ, ঠিক, নিশ্চয়ই বলেছি। বোঝানোর জন্যেই বলতে হয় ও-রকম। কিন্তু সব সময়েই যে বোঝাবার জন্যে তা নয়। যতটুকু বললে লোকে খবরটা বুঝে যায়, তার চেয়ে বেশিও অনেক সময়ে বলতে ইচ্ছে করে। কেন ইচ্ছে করে জানিস? খবরের চেয়ে আরো একটা বড় জিনিস পাওয়া যায় তাতে।

খবরের চেয়ে বড়? সে কী-রকম?

নন্তু বলল : খবরের চেয়ে বড় হল খাবার। দুটো আ-কার বাড়তি পাওয়া গেল।

ওর কথায় কান না দিয়ে বলি : চারুকে নিয়ে সেদিন যে তোরা হাসাহাসি করছিলি, মনে আছে?

বৌদি ঢুকেছিলেন ঘরে। হঠাৎ চারুর নাম শুনে বললেন : আবার চারুকেও দরকার হল তোমাদের আসরে? কী নিয়ে হাসাহাসি?

সে তুমি জানো না বৌদি, সে এক কান্ড। লোডশেডিং-এ তো দিশেহারা সবাই। চারু ঠিক করতে পারছে না কী ভাবে শুলে ঠিক আরাম হবে। দুপুরের গরমে দেখি সে শুয়ে আছে অর্ধেক ঘরে আর অর্ধেক বারান্দায়। কোমরটা চৌকাঠের ওপর।

যাঃ, বাজে গল্প।

আরে, সবাই আমরা দেখেছি। কিন্তু সেটাও কোনো কথা নয়। কথা হচ্ছে, টুম্পি এসে আমাকে বলল, কাকু, চারুদি শুয়ে আছে ঠিক যেন দক্ষিণ আমেরিকা আর উত্তর আমেরিকা।

টুম্পির এই মৌলিক বর্ণনা শুনে, অল্প একটু হেসে, ফিরে গেলেন বৌদি। লাজুক মুখে জিজ্ঞেস করল টুম্পি : তাতে কী হল? বললে কেন গল্পটা?

বললাম কেন? ধর তুই যদি বলিস যে চৌকাঠের এধারে পা ওধারে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে চারুদি, তাহলে বুঝতে অসুবিধে হয় না কারো। কিন্তু যেই তুই ওর মধ্যে আমেরিকার ছবিটা এনে ফেললি, অমনি চারুর শোয়াটা আরো বেশি মজার হয়ে উঠল।

চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে নন্তু জিজ্ঞেস করল : কী-রকম?

ওই-যে ম্যাপে দেখিস দুই আমেরিকা যেন জুড়েও আছে আবার আলগাও, যেন এক আবার এক নয়ও—চারু হঠাৎ হয়ে গেল সেইরকম। যেন একটা মানুষ নয়, দুটো মানুষ, মধ্যে একটু কোমর। আর তাছাড়া, পায়ের দিকটা তো দক্ষিণের মতো সরুও হয়ে এসেছে, তাই না?

টুম্পি একটু ভয়ে ভয়ে বলল : আমি কিন্তু অতশত ভেবে বলিনি।

তা নয় রে। এগুলি যে কেউ যুক্তি করে বুদ্ধি করে সাজিয়ে বলে তা তো নয়। ওই-রকমের একটা বোধ দপ্ করে জেগে ওঠে মনে, আর টেনে আনে এক-একটা ছবি। ছবিটাই থাকে, ছবিটাই কথা বলে, ভাবনাটা থাকে লুকোনো।

নন্তু তার টেবিল থেকে ম্যাপ - বইটা খুঁজছে। টুম্পির একটা ভুল ধরা দরকার। নইলে ভাল লাগছে না তার। (ক্রমশ)

চামেলির গোপন কথা, আরো

প্রসাদ

I'm very unhappy. I've been very unhappy since this morning. I was unhappy at school. I was so unhappy in the afternoon. I didn't want to go out to play.

Araballi is missing. She's been missing since this morning. When I woke up this morning Ara didn't come to me in my bed. I called, "Ara, Ara", but she didn't come. I looked everywhere for her. She wasn't in the house. She wasn't in the garden. I looked in the street. She wasn't there.

When I came back from school I ran into the house. "Ara, Ara", I called. She wasn't anywhere. Mummy says Ara hasn't been home all day.

What has happened to poor Ara? I hope she's not dead. I hope she has not been run over by a car.

I'm so miserable. Dear God, please make Ara come back.

সবচেয়ে আগে তোমাদের আবার মনে করিয়ে দিই :

I'm=I am; I've= I have; didn't = did not; she's = she is; wasn't=was not; hasn't=has not.

মিলি এখন বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে আরাবল্লী যাতে ফিরে আসে। আমরাও প্রার্থনা করি আরা ফিরে আসুক। আবার সেই সঙ্গে মিলির কথাগুলো একটু লক্ষ করে দেখি।

I am very unhappy.

I have been very unhappy since this morning.

I was unhappy in the afternoon.

Araballi is missing.

She has been missing since this morning.

She was missing when I came home from school.

সব শেষের বাক্যটা ঠিক ওই ভাবে মিলির ডায়েরিতে নেই, কিন্তু থাকতে পারত।

আসলে যেটা তোমাদের লক্ষ করতে হবে তা হল :

এখনকার কথা, আগেকার কথা, আর আগে থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত যা চলছে তার কথা, এই তিন রকম বিষয় নিয়ে কিছু বলতে গেলে তিন ধরনের বাক্য কী-রকম হবে। বুঝতেই পারছ এই রকম হবে :

I am, I was, I have been.

You are, you were, you have been.

Ara is, Ara was, Ara has been.

তেমনি আবার :

I run, I ran, I have run.

You run, you ran, you have run.

He runs, he ran, he has run.

কিন্তু আরেকটা বাক্য দেখেছ :

Ara has not been home all day.

এবার তাহলে উপরের সমস্ত বাক্যগুলো উল্টো করে লেখো। উল্টো করে মানে 'হয়'কে নয়, আর 'নয়'কে হয় করে। যেমন প্রথম বাক্যটা হবে :

I have not been very unhappy.

তারপর লিখে যাও।

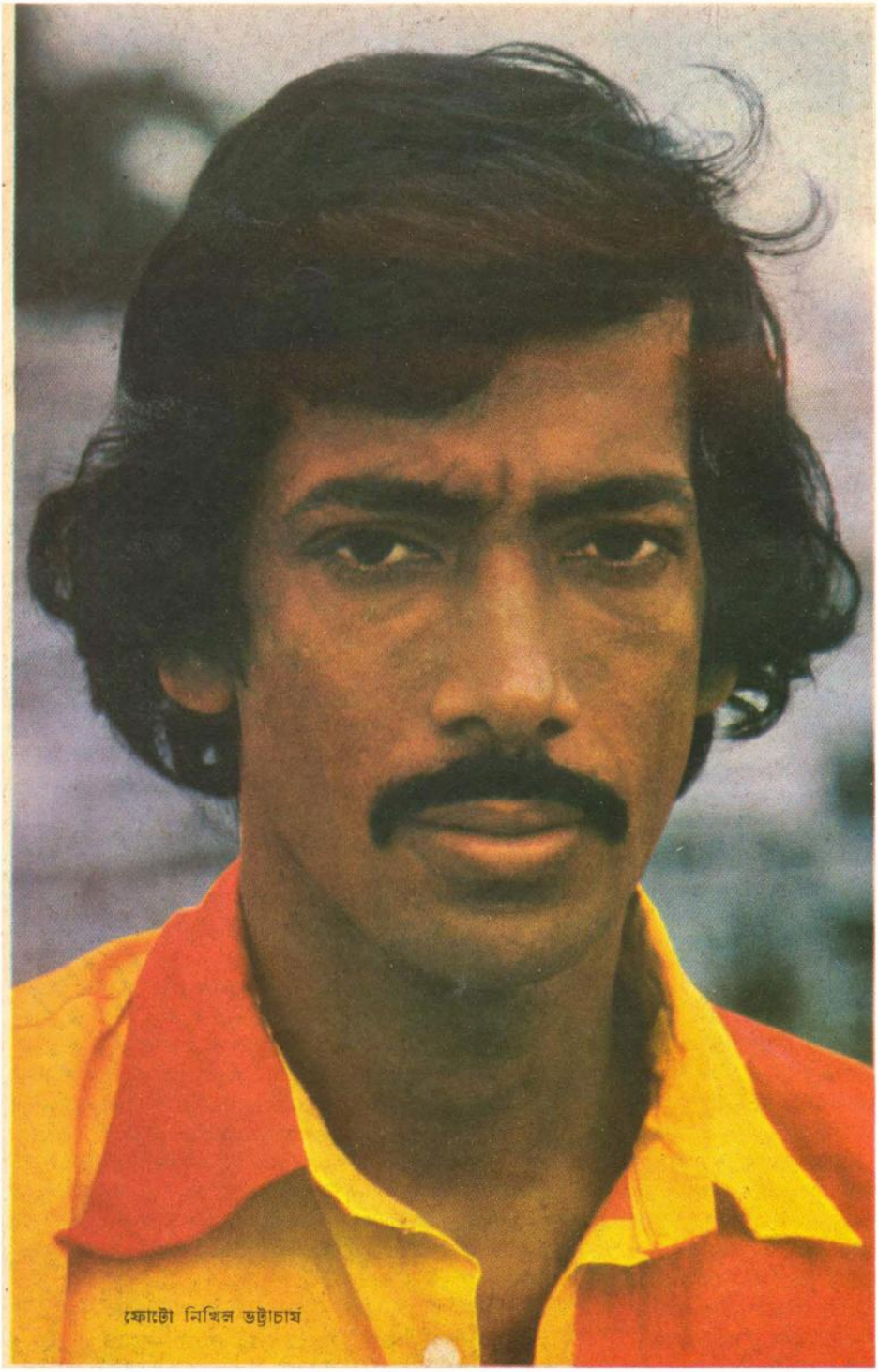

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

দারুণ খেলছেন সাব্বির

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

সত্যি কথা বলতে কী এবার ফুটবল মরসুম শুরু হওয়ার আগে সাব্বির আলিকে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মহলে ছিল কুণ্ঠা, দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব। কর্মকর্তারা স্পষ্ট করে না বললেও বোঝা যাচ্ছিল যে, প্রথম একাদশের চার ফরোয়ার্ড কে-কে হবেন। সুরজিৎ, মিহির, ডেভিড উইলিয়ামস আর হরজিন্দার। এর মধ্যে সাব্বির আসবে কী করে? কিন্তু পরিস্থিতির অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন হল। দেখা গেল, প্রথম দু'তিনটে ম্যাচে সাব্বিরকে নামানো ছাড়া উপায় নেই।

আর এখন?

এখন সাব্বিরকে বসিয়ে ইস্টবেঙ্গলের দল নামানোর কথা কেউ বললে সকলেই ভাববে যে, নির্ঘাত তার মাথার গোলমাল হয়েছে। এত ভাল খেলছেন সাব্বির। এই লেখার সময় পর্যন্ত উনি টপ স্কোরার হয়ে বসে আছেন। শুধু তাই নয়। দু'দিন ও'র গোলে আর একদিন ও'র পাস থেকে করা সুরজিতের গোলের জন্যেই ইস্টবেঙ্গল পুরো পয়েন্ট ঘরে তুলতে পেরেছে। সাব্বির এবার দারুণ খেলছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "গতবার এ-রকম খেলা কোথায় ছিল?" লাজুক হেসে সাব্বির বললেন, "খেলার অনুমতি পাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তার ফলে আট-দশ মাস একেবারে প্র্যাকটিস করতে পারিনি। তা ছাড়া, গত বছর এমন এক সময় খেলতে নামলাম যখন ক্লাবের তিন-তিনটে পয়েন্ট নষ্ট হয়ে গেছে। তাই, সব দিক দিয়েই মনের উপর প্রচণ্ড চাপ ছিল। সেটা আর কাটিয়ে উঠতে পারিনি।"

হায়দ্রাবাদের সুবিখ্যাত সালার জং মিউজিয়ামের পিছনে দারুসিফা অঞ্চলে সাব্বিরদের বাড়ি। (হ্যাঁ, উনি সাব্বির—"সাবির" নন। আমি কোনও প্রশ্ন করার আগেই উনি বানান করে নিজের নাম বলে দিলেন। অনুযোগ করলেন, অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাতেই পিতা হাবিব বির্জির রাখা নামটি ঠিকভাবে লেখা হয় না।)

বলতে গেলে বাড়ির গায়েই খেলার মাঠ। ও'র দাদারাও খুব ফুটবল খেলতেন। সুতরাং অল্প বয়েস থেকেই বল পেটাতে শুরু করেন সাব্বির। প্রথম ক্লাব দারুসিফার আব্বাস ইউনিয়ন এফ সি। সেটি অবশ্য অননুমোদিত। এর পর দ্বিতীয় বিভাগের দল হায়দ্রাবাদ আরসেনাল। কলেজে পড়তে পড়তেই অন্ধ্র প্রদেশ স্পেশাল পুলিসে খেলতেন। পরের পাঁচ বছর বোম্বের টাটা স্পোর্টসে খেলেন। ১৯৭৮ সাল থেকে ইস্টবেঙ্গলে।

"ইস্টবেঙ্গলে কেন?"

"১৯৭২ থেকেই কলকাতার তিন বড় দলই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু, সবচেয়ে আন্তরিক চেষ্টা ছিল ইস্টবেঙ্গলের। এই দলে আসার আরও একটা বড় কারণ, আমার নিজেরই ইস্টবেঙ্গলের খেলা খুব ভাল লাগত।"

সাব্বিরের মতে, কলকাতায় খেলে আনন্দ আছে। ও'র সবচেয়ে প্রিয় খেলোয়াড়কেও পাশে পেয়েছেন। কে ও'র প্রিয় খেলোয়াড়? সুরজিৎ। ভারতের বাইরে—পেলে। কিন্তু পেলের খেলা দেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি ও'র। কোনও উপায়ও ছিল না। কসমস—মোহনবাগান ম্যাচের পরদিনই টাটার হয়ে ওঁর শেষ খেলা। এ দুঃখ ওঁর কোনও দিনই যাবে না।

সাব্বিরের মতে, বাংলার ফুটবলের মান খুব উঁচু। কলকাতার তিন প্রধান মরসুমের গোড়ার দিকে দু-তিনটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে বটে, কিন্তু তাতে কিছু

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে

ছোটদের হাতে বই তুলে দিন

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

বাঙলার ডাকাত

সত্যি ডাকাতের গল্প ১ম–৪র্থ। প্রতি খণ্ড ৬ টাকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কিশোর অপু ১২৲

পথের পাঁচালী, অপরাজিত ও কাজল-এর
কিশোর সংস্করণ

অপুর ছেলেবেলা ৬৲ ॥ ছোটদের অপরাজিত ৬৲
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ॥ ছোটদের কাজল ৬৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

টেনিদার অভিযান

টেনিদার সবকটি অভিযান একসঙ্গে দাম ১০ টাকা

কিশোর সাহিত্যের অভিনব
সংযোজন

শার্লক হোমসের
কিশোর গোয়েন্দা গল্প

ভাষান্তর ও সম্পাদনা : পৃথ্বীরাজ সেন

শিকার ও অভিযান কাহিনী

অমিতাভ চক্রবর্তীর ॥ ছোটদের বাঘের গল্প ৫৲
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোর॥সুন্দরবনে সাত বৎসর ৬৲
শিশির ঘোষ ॥ লাহুল সিংহের সন্ধানে ৬৲

রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা কাহিনী

কোনান ডয়েলের ॥ কিশোর গোয়েন্দা গল্প ৭৲
দক্ষিণারঞ্জন বসুর ॥ কায়াহীনের কবলে ৪৲
দীনেন্দ্র কুমার রায়ের ॥ যখের আসন ৬৲
বিশু মুখোপাধ্যায়ের ॥ বিখ্যাত দস্যু কাহিনী ৫৲

মণি বাগচী প্রণীত
শতবর্ষের জীবনী সাহিত্য
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ৮৲ ॥ ডঃ ভাবা ৪৲
বিজ্ঞানী ... জগদীশ ৪৲
আলোকময়ী শ্রীমা ৬৲

শৈব্যা
৮/... সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রমাণিত হয় না। আর এখানে ফুটবলকে দর্শকরা এত সিরিয়াসলি নেন যে, সাব্বির মুগ্ধ। তবে মহারাষ্ট্র, গোয়া, কেরল ও পাঞ্জাবও ফুটবলে কম যায় না। ফুটবলে ভারতের ব্যর্থতা সম্পর্কে ও'র বক্তব্য, "আমাদের ঠিকমতো তালিম হয় না। প্রতিযোগিতার ১৫/২০ দিন আগে ক্যাম্পে গিয়ে কতটুকুই বা আর শেখা সম্ভব। নইলে, স্কিল, স্ট্যামিনা সবই তো আমাদের আছে।''

সাব্বিরের সাড়ে চব্বিশ বছরের জীবনে এ-পর্যন্ত সবচেয়ে স্মরণীয় খেলাটি হল ১৯৭৪-এ এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় তাইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ঐ খেলায় ভারত ২—১ গোলে জেতে, একটি গোল ছিল সাব্বিরের।

আর, কোন্ খেলার স্মৃতিকে উনি মন থেকে মুছে ফেলতে চান?

একটু চুপ করে থেকে সাব্বির বললেন, "গতবার লীগে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচটা। ওতে আমি কিছুই করতে পারিনি।''

প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করলাম, কী রকম মাঠ ও'র পছন্দ। উনি বললেন, ''একটু ভিজে মাঠ।''

সাব্বির অবসর কাটান বই পড়ে। প্রধানত গোয়েন্দা উপন্যাস। অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন, জেমস হ্যাডলি চেজ, সিডনি সেলডন পেলে উনি বোধহয় খাওয়া আর ঘুম ভুলে যাবেন। গান শুনতেও ভালবাসেন সাব্বির। ঘরে রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ রেকর্ডার আর অজস্র রেকর্ডের ছড়াছড়ি। সিনেমা দেখাও বাদ যায় না। তাই বলে উপাসনার জন্যে মসজিদে যেতেও ভুল হয় না ও'র। তবে বাইরে বেরুলে ফ্যানদের কবলে পড়তে হয় প্রায়ই!

আনন্দমেলার পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে সাব্বিরের বক্তব্য : খেলাধুলো করলেই লেখা-পড়াকে অবহেলা করতে হবে, এটা কোনও কাজের কথা নয়। লেখাপড়া ঠিকমতো না শিখলে অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়, এটা যেন কেউ না ভোলে।

চুপি চুপি একটা কথা বলে রাখি। চিলি চিকেন আর বিরিয়ানি খেতে সাব্বির খুব ভালবাসেন। রুম-মেট সাজ্জাদও সেই কথাই বললেন। তাই বলে তোমরা সব্বাই যদি ওঁকে ওই সব খাওয়াতে চাও, তাহলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রিয় খাবারে ওঁর অরুচি ধরে যাবে।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

দুর্দান্ত শ্যাম

অশোক দাশগুপ্ত

মহমেডানের সঙ্গে খেলার আগের ম্যাচে মোহনবাগান খেলেছিল ক্যালকাটা জিমখানার বিরুদ্ধে। খেলা শুরু হওয়ার আগে মোহন-বাগান টেন্টের প্লেয়ার্স রুমের সামনে দাঁড়িয়ে শ্যামের সঙ্গে কথা বলছিলাম। প্লেয়ার্স রুম থেকে বেরিয়ে এসে সুব্রত ভট্টাচার্য বললেন, "আবার সেই শ্যাম?" সেই ব্যাপারটি মনে রেখেই সুব্রত এই কথা বললেন কিনা জানি না, তবে আনন্দমেলার পাঠক-পাঠিকাদের মনে থাকতে পারে যে, শ্যামের গোলে ফয়সালা হওয়া গত বছরের মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ সম্পর্কে আমার লেখায় শিরোনাম ছিল—'আবার সেই শ্যাম'।

এবার মোহনবাগানের একটা ছোট ম্যাচে মাঠে যেতে পারিনি। রিলে শুনছিলাম সুভাষ ভৌমিকের সঙ্গে ঘরে বসে। শ্যাম একটির পর আর একটি ব্যাকভলি পায়ে লাগাতে না পারায় একসময় বলে ফেললাম, "এটাও পারল না!" তখন খুব নিশ্চিত গলায় সুভাষ ভৌমিক মন্তব্য করলেন, "শ্যাম থাপার ব্যাপারস্যাপার আলাদা আসল দিনে ঠিক কাজ করে দিয়ে চলে যাবে।" ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আসল কাজ করতে পারেনি শ্যাম। কিন্তু কে বলবে যে, ২১ জুলাই মহমেডানের বিরুদ্ধে খেলাটাও তার আসল খেলা নয়! শ্যাম ওই গোল না করলে মোহন-বাগানকে হয়তো এক পয়েন্ট মাঠে রেখেই ফিরতে হত। ওদিকে হাসতে হাসতে লীগ নিয়ে যেত ইস্টবেঙ্গল। এরপরও ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, কিন্তু মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে রেখে দিয়েছে শ্যামের ওই দুর্দান্ত ভলি।

প্রথম কয়েক মিনিট এলোমেলো খেলার পরে মোহনবাগান খেলাটি ধরে নেয় প্রধানত তিনজনের নৈপুণ্যে—গৌতম, প্রসূন এবং পায়াস। দুই স্টপার এবং শ্যামও সাহায্য করতে থাকেন।

ফোটো তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

মোহনবাগানের দুই দুরন্ত ডানাকে এইদিন প্রায় স্তব্ধ করে দেন কেরলের বিখ্যাত উইংব্যাক প্রেমনাথ ফিলিপ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার কালিকাপুরের উঠতি হিরো গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি। মাঝখানে মইদুল ইসলামের উচ্চতাও ক্রমশই বাড়তে থাকে।

কুড়ি মিনিটের মাথায় কম্পটন দত্ত এবং গৌতম সরকার হয়ে বল যায় প্রসূন ব্যানার্জির পায়ে। প্রসূনের বিপজ্জনক 'চিপ' মইদুলের মাথা আলতোভাবে ছুঁয়ে বাতাসেই ভাসতে থাকে। ব্যাকভলি করার জন্য ওঠেন, শ্যাম নন—পায়াস। পায়াসের ব্যাকভলি আড়াআড়িভাবে উড়ে যায় গোল থেকে প্রায় পনেরো গজ দূর দিয়ে। খেলাটির ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ওখানেই অপেক্ষা করছিলেন শ্যাম থাপা। জাল থেকে বল বার করে আনেন মহমেডানের গোলকীপার নাসির আমেদ। মাত্র চার গজ দূর থেকে ঠেললেই যখন গোল, তখন গায়ের জোরে শট করে কী লাভ! তাতে কি দুটো গোল পাওয়া যায়? পায়াস সেই ভুলই করলেন খেলার চুয়াল্ল মিনিটে। বল ক্রসবারের নীচে লেগে ফিরে এল।

এরপরেই খেলার মেজাজ পালটে দিলেন সমরেশ চৌধুরী, হাবিব এবং খাবাজি। শেষের প্রায় ষোল মিনিট সাদাকালো জার্সি ঝলমল করছিল মধ্যমাঠে। মোহনবাগান পেনালটি বক্সের দিকে উঠে আসছিল একাধিক আক্রমণ। কয়েকবার বল ছিটকে এল সুব্রত ভট্টাচার্যর মাথা হয়ে। একবার সমরেশ চৌধুরীর অনবদ্য থ্রু পাস মোহনবাগান ডিফেন্স চিরে বেরিয়ে এল, হাবিবও এসেছিলেন, কিন্তু উনিশশো উন-আশির হাবিবের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হল না। দুতিন বছর আগে হলেও, এমন ক্ষেত্রে প্রতিক্ষপ গোলকীপারের আর কিছুই করার থাকত না—জাল থেকে বল কুড়িয়ে আনা ছাড়া।

খেলা যখন প্রায় শেষ, তখন নিজের অস্তিত্বকে টের পাইয়ে দিতে লতিফুদ্দিন নিলেন প্রায় চল্লিশ গজ পাল্লার এক ভয়ংকর শট। বল বার ছুঁয়ে বাইরে চলে যায়। প্রতাপ উড়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বল আর ইঞ্চি কয়েক নীচে থাকলে—দিনের নায়কের নাম হত লতিফুদ্দিন।

শ্যামের কথায় শুরু করেছিলাম, শ্যামের কথা দিয়েই শেষ করি। কিছুদিন আগে গোল-কীপার ভাস্কর গাঙ্গুলিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—"গোলের সামনে কোন ফরোয়ার্ডকে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক মনে হয়।"

ভাস্কর গাঙ্গুলির জবাব "শ্যাম থাপা।"

আশা করি, অন্তত এখন কিছুদিনের জন্য, নাসির আমেদের জবাবও অন্য কিছু হবে না!

ফাস্ট বোলার চাই

অলোক দাশগুপ্ত

প্রুডেন্সিয়াল কাপে ভারত শোচনীয়ভাবে হেরে যাওয়ার পরে অধিনায়ক বেঙ্কটরাঘবন মন্তব্য করেছেন, "ব্যাটিং-বিপর্যয় আমাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।"

বিশ্বকাপের তিনটি ম্যাচের একটিতেও ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বড় রানের ইনিংস গড়ে তুলতে পারেননি। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের এই দুর্বল চেহারাটা অনেকদিন আগেই আমাদের চোখে পড়েছে। আমরা জেনে গেছি যে, ভারতীয় ব্যাটিং গাভাসকর এবং বিশ্বনাথের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

যে অপ্রিয় সত্যটা আমরা এড়িয়ে যেতে চাইছি, তা হল আমাদের বোলিং নিয়ে। স্পিন

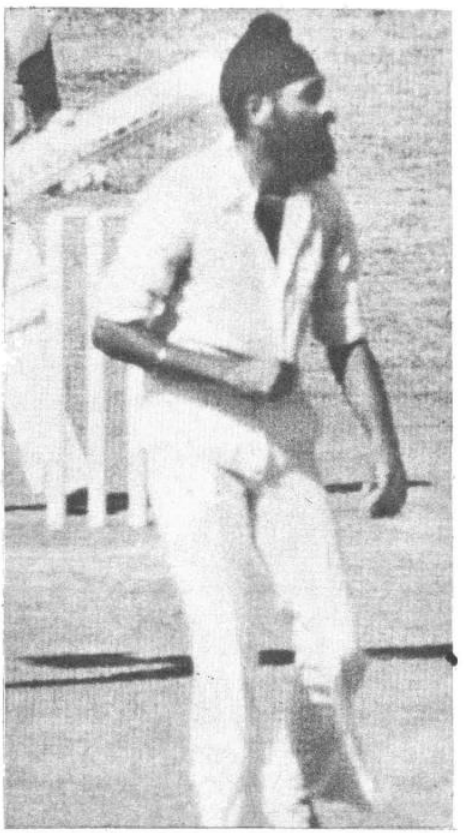

বেদী নন, ইনি রাজিন্দার সিং হন্স

বোলিংয়ে আমরা পৃথিবীর সেরা বলে দাবি করতাম একসময়। এখন আর সে দাবি করা যায় না। বোলিংয়ের ধার এখন অনেকটা ভোঁতা হয়ে গেছে। প্রুডেন্সিয়াল কাপের তিনটি ম্যাচে আমাদের বোলাররা মাত্র ছ'টি উইকেট পেয়েছেন। (বাকি দুটি রান আউট)। এর মধ্যে চারটি উইকেট আবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে, যে-দলের খেলোয়াড়রা এখনও টেস্ট খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। দুই স্পিনার বেদী এবং বেঙ্কট একটিও উইকেট পাননি।

এজবাস্টনের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ড ভারতীয় বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ স্কোর এবং ৬৩৩ রানের রেকর্ডটি গড়েছে মাত্র পাঁচটি উইকেট হারিয়ে। ইচ্ছে করলে ব্রিয়ারলির দল হয়তো এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটিও ভাঙতে পারত। বয়কটের দেড়শো এবং গাওয়ারের অপরাজিত দুশো রানের পাশাপাশি মিলারের সেঞ্চুরি করাও অসম্ভব ছিল না।

আমার মনে হয়, সত্তর দশকের গোড়ার দিকে বিদেশে ভারতীয় স্পিনারদের অসামান্য সাফল্যই ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমান অবস্থার জন্যে দায়ী। চন্দ্র, বেদী, বেঙ্কট এবং প্রসন্নকে দারুণ বল করতে দেখে আমরা ক্রমশ ওই চারজন খেলোয়াড়ের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। এমন একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় দলে দুজন নিয়মিত ফাস্ট বোলারও স্থান পেতেন না। গাভাসকর সুরিন্দার অমরনাথকে নতুন বলের পালিশ তোলার দায়িত্ব দেওয়া হত। ভারতের উইকেটগুলিকে স্পিনারদের সাফল্যের জন্য স্লো উইকেটে পরিণত করা হয়। কিন্তু এতে আমাদের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়েছে। সাময়িকভাবে দু'তিনটি টেস্টে আমরা জয়ী হয়েছি বটে কিন্তু ভারতীয় ব্যাটিং ক্রমশ মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছে, বিদেশের উইকেটে বল মাটিতে পড়ে যখন বেশ জোরে ছুটেছে তখন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হয়েছেন বারবার।

শুধু তাই নয়, ওই চারজন স্পিনারের ওপর অতিরিক্ত আস্থা থাকার জন্যে আমরা উঠতি স্পিনারদের ঠিকমতো কাজে লাগাইনি। ফলে, আজ বেদী-চন্দ্রদের শূন্যস্থান পূরণ করার মতো বোলার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু, যাঁরা আছেন তাঁদেরও কি ঠিক-

কপিল (এজবাস্টনে পাঁচ উইকেট)

মতো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে? দু'বছর আগে অস্ট্রেলিয়া সফর সেরে ভারতীয় ক্রিকেট দল যখন দেশে ফিরে এসেছিল তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, বেদী-চন্দ্রদের দিন ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তান সফরে কিংবা কালীচরণের 'দ্বিতীয় সারির' ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে রাজিন্দার সিং হনস বা শিবলাল যাদবকে সুযোগ দেওয়া হয়নি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেদী, চন্দ্র, বেঙ্কটদের সমসাময়িক খেলোয়াড় বলতে এখন টিঁকে আছেন মাত্র দুজন। তাঁরা হলেন—জিওফ বয়কট এবং ক্লাইভ লয়েড, দুজনেই ব্যাটসম্যান। ক্রিকেটে একজন বোলারের চেয়ে একজন ব্যাটসম্যানের আয়ু সাধারণত বেশি হয়। সুতরাং, এখন আমাদের বেদী চন্দ্রের বদলি তরুণ স্পিনার খুঁজে বের করতে হবে।

কুড়ি বছরের কপিলদেব নিখাঞ্জ এজবাস্টন টেসটে পাঁচটি উইকেট নিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, নিসার, অমর সিং; সুটে ব্যানার্জির দেশ ভারতে ফাস্ট বোলার তৈরি করা অসম্ভব নয়। ফাস্ট বোলার তৈরির কাজে আমাদের নজর দিতে হবে। আর চাই ফাস্ট উইকেট, যা ফাস্ট বোলার তৈরি করতে কাজে লাগে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ফাস্ট বোলিং মোকাবিলা করার জন্যও গড়ে তুলতে হবে।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

পরীরা এখনও আছে

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

টুংকা সেই স্বপ্নটা দেখবার পর থেকে বেশ মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। কী যে হচ্ছে তারপর থেকে; কিছুই বুঝতে পারছে না। স্বপ্নটা কিন্তু ভারী মিষ্টি। আর যখন টুংকা স্বপ্নটা দেখছিল, তখন মনেই হয়নি যে, ও স্বপ্ন দেখছে। ও দেখছিল, একটা ভারী সুন্দর বাগানের মধ্যে ও বেড়াচ্ছে। সে বাগান এক কথায় অপূর্ব। গাছগুলির পাতা কীরকম চোখ-জুড়নো সবুজ। আর ফুলেরই বা কী বাহার। নীল, লাল, হলুদ ফুল তো টুংকা অনেক দেখেছে হর্টিকালচারের বাগানে কিংবা লেকের লিলিপুলে আর শান্তিনিকেতনের গাছে-গাছে। এ ফুলগুলির জেল্লা অনেক বেশি। ঝরনা রয়েছে তার ওপর আবার। ওর বইতে যে 'ঝর্না ঝর্না সুন্দরী ঝর্না' কবিতাটা আছে, তারই মতন সুন্দর। সেই বাগানের পাখিদের রঙও খুব সুন্দর। কোথাও পেখম তুলে ময়ূর নাচছে, কোথাও ধনেশ পাখি গম্ভীর চোখে লম্বা ঠোঁট নিয়ে গাছের ডালে বসে আছে। সেই বাগানে টুংকা আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘাসের আস্তরণটা গালচের মতো মনে হচ্ছিল। খালি পায়ে দৌড়তে কী মজা। টুংকার মনে হল, ওর নাচের মহড়াটা দিয়ে নিলে মন্দ হয় না। দুদিন বাদেই স্কুলে একটা অনুষ্ঠানে ওর একটা নাচ আছে। পরীর নাচ। ও একটু তৈরি হয়েই নাচ শুরু করে দিল। দুঃখ হ'ল গৌরীদি নেই যে গান ধরবে: 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'। তবু ওর নিজের মনে নেচেই চলল। একবার, দুবার, তিনবার নাচল। তারপর যখন হাঁফ ধরতে লাগল, তখন সেই ঘাসের গালচের ওপর বসে পড়ল। আর সেই সময় থেকেই স্বপ্নটা অদ্ভুত হয়ে গেল। হঠাৎ ও চোখ মেলে দেখল ওর পাশে একজন পরী দাঁড়িয়ে রয়েছে। রূপকথার পরীরা যেমন হয় ঠিক সেই তেমনটি। তোমরা হাসছ তো? আর বলছ তো পরী আবার আছে নাকি? তা তোমাদের আর কী দোষ? টুংকা তো নিজেই জানে, পরী-টরি সব বানানো গল্প। তাছাড়া ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প পড়ে জেনেছে যে, পরীরা কেন আসে না। কিন্তু তাই বলে নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না, হলই বা তা স্বপ্নের চোখ। টুংকা দেখল পরী ওর দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। নীলচে রঙের শাড়ি পরা পিঠের কাছে দুটি ডানা থির-থির করে কাঁপছে। নীলপরী টুংকাকে বলল, "তুমি ভাই আমাদের নাচ এমন সুন্দরভাবে কার কাছে শিখলে?" পরীর সঙ্গে তোমরা কেউ কখনো কথা বলনি। টুংকাও বলেনি। তাই প্রথমটা টুংকা একটু

থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু টুংকা বেশিক্ষণ থতমত খেয়ে থাকবার পাত্রীই নয়। সেই যেবার এক জাপানি ভদ্রলোক টুংকাদের বাড়ি এসেছিলেন, সেবারেও ও কত কথা বলেছিল। আর এখানে তো পরী দিব্যি বাংলা বলছে। ও উত্তর দিল, "কলাবতীদির কাছে শিখেছি।" নীলপরী বলল, "বাঃ। তুমি আরেকটা নাচ দেখাবে?" টুংকার নাচ দেখাতে একদমই আপত্তি নেই। বরং বাড়িতে কেউ এলে কতক্ষণে বাবা কিংবা মা টুংকাকে নাচতে বলবেন তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। কখনো-সখনো একটু হাত-পা নাড়িয়ে জানিয়েও দেয় যে, বাবা মা ভুলে গেছেন। সুতরাং ও এবার 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি' একলাই নেচে দেখিয়ে দিল। নীলপরী খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। তারপর বলল, "তোমাকে বর দিলাম, এক বছর ধরে তুমি যা চাইবে তা-ই হবে।"

এরপর যা হবার তা-ই হল। অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড, গ্রীম-ভাইদের রূপকথা, হযবরল বা ওই ধরনের গল্পে যা হয়, এখানেও তাই হল। ঘুমটা ভেঙে গেল। ও শুনতে পেল মা ডাকছেন, 'মামণি উঠে পড়ো, স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।' আর ওই যে—(টুংকা খারাপ কথা বলে না, তাই এই ফাঁক) দাদাটা বলছে, "কুম্ভকর্ণ আসলে নিশ্চয় মেয়ে ছিল, রামায়ণটা আরেকবার পড়তে হবে," তাতে ওর মনে হল, দাদাটার কানমলা খাওয়া উচিত। কী যে সব বাজে নিয়ম বয়সে বড়দের সম্বন্ধে রয়েছে। তারপরে যা হল, তোমরা বিশ্বাস করতে চাইবে না। বাবা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন আর সোজা গিয়ে দাদার দুই কান আচ্ছা করে মলে দিয়ে বললেন, "হতচ্ছাড়া ছেলে, কতদিন বলেছি, আমার ব্লেড দিয়ে পেনসিল কাটবে না, আবার তাই করেছ।" দাদা কানে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "মিছিমিছি আমার কান মললে। আমি করিনি। ও নিশ্চয় এ-বাড়ির আহ্লাদী মেয়ের কীর্তি। কেউ একদম শাসন করে না বলে উচ্ছন্নে যাচ্ছে।" উচ্ছন্নে যাওয়া ব্যাপারটা সত্যি নয়। উচ্ছন্ন কাকে বলে টুংকা তা জানেই না। তবে পেনসিল কাটার ব্যাপারটা ঠিক। পেনসিল কাটার কলগুলি একদম যাচ্ছেতাই। ও তাড়াতাড়ি বলল, "সত্যি, দাদার দোষ নেই, আমি কেটেছি। আমি ভেবেছিলাম ওটা তোমার পুরনো ব্লেড।" বাবা গম্ভীরভাবে বললেন, "ভবিষ্যতে এরকম ভেবো না।" নীল পরীর স্বপ্নের কথা টুংকার মনে হয়ে গেল।

তারপর থেকে টুংকাকে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে। এমন-কী, খুব ভুল করে চাইলেও সেই জিনিস ও পেয়ে যাচ্ছে। সেদিন যখন ইস্টবেঙ্গলের কাছে মোহনবাগান তিন গোলে হেরে গেল, আর দাদার বন্ধুরা একটা হলদে লাল গেঞ্জি এনে দাদাকে জোর করে পরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল, তখন টুংকার খুব কষ্ট হয়েছিল। দাদার সঙ্গে খুনসুটি হচ্ছিল। দাদা ওদের স্কুলের ইউনিফর্ম সম্বন্ধে যা-তা বলছিল। ও তাইতে বলেছিল, "কলেজে গেলে কী হয়, তোরও তো এমন-কিছু বয়েস হয়নি, তাই তোরও একটা ইউনিফর্ম পরলে খুব ভাল হত।" কথাটা হয়তো খুব ভাল নয়, কিন্তু দাদার কথাটাই বা কী ভাল ছিল? দাদা গেল রেগে, আর চুলের মুঠি ধরে টেনে দিল। টুংকার

সোজাসুজি বলো

আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ক্রিকেট ম্যাচ চলছে। দারুণ উত্তেজনা। সব গাড়ি অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সামনের বাড়ির দোতলার জানলা থেকে ইংরেজিতে কমেন্টারিও খুব জমে উঠেছে। হঠাৎ এক দুর্ঘটনা, ভাষ্যকারের গলা আরো এক পর্দা চড়ল। "Oh! A tragic accident. Subimal Sen, the great batsman, has slipped and fallen and his ankle is twisted".

আমার মনে হল বেচারি সুবিমলের পা-ই শুধু মচকায়নি, ভাষাটাও এখানে একটু মচকে গেল।

এক্ষেত্রে ইংরেজি অত কর্মবাচ্যের ধার ধারে না, সোজাসুজি বলে:

Subimal Sen has twisted his ankle.

ইংরেজিতে রীতিটাই এই, কর্মবাচ্য কিংবা ভাববাচ্যের চেয়ে কর্তৃবাচ্যের দাপট বেশি। আমরা যেখানে বলি, রামের মাথা ভেঙে গেছে, শ্যামের দেরি হয়ে গেছে, ইংরেজিতে বলে:

Ram fell from the tree and broke his head.

Shyam is late.

রাগ হল। বলল, "বলছি, দেখবি তোর মোহন-বাগান গোহারান হারবে।" তারপর এই কাণ্ড। দাদার শুকনো মুখটা দেখে ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া মোহনবাগান হারাতেও ওর কষ্ট হয়েছে কারণ ও নিজেও তো মোহনবাগানের সাপোর্টার।

সেখানেই কি শেষ? এই সেদিন ও পিউয়ের সঙ্গে খেলছিল। আর ভুলোটা ওর কাছে এসে ওর গায়ের ওপর পড়ছিল। আসলে ভুলোটা ভীষণ হিংসুটে। ও পিউয়ের সঙ্গে খেলছে এটা ভুলোর পছন্দ নয়। ভুলো তাই টুংকাকে তার দিকে টানতে চাইছিল। এই করতে গিয়ে টুংকাকে একবার আঁচড়িয়েই দিল ভুলো। টুংকা তখন বলে ফেলল, "তুই দূর হলে আমি বাঁচি।" সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা ময়নাদি এল বেড়াতে। ভুলোকে দেখে ভারী খুশি। কোলে তুলে আদর-টাদর করে অস্থির করে ফেলল। শেষে মা'র কাছে আবদার করল, "মামি, তুমি ভুলোকে আমায় দাও। আমার লালুটা মরে যাওয়ার পর থেকে বাড়িটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে।" বলতে-বলতে ময়নাদির গলা ধরে গেল। আর মা'ও গলে গিয়ে ভুলোকে দিয়ে দিলেন। আসলে মা কুকুর-বেড়াল একদম পছন্দ করেন না। সুতরাং ময়নাদি চাইতেই যেন বেঁচে গেলেন। ভাবো কাণ্ড। নীলপরী কি ও কী চায় সেটা বোঝে না? সেদিন রাত্রে শুতে যাবার সময় আবছা করে মনে-মনে বকুনি দিল ও নীলপরীকে।

কিন্তু গোলমেলে কাণ্ড হয়েছে ওই দুটিই। বাকি সব ব্যাপারে টুংকার আনন্দ বেড়েছে বই কমেনি। এক মাসের মধ্যে ও প্ল্যানেটারিয়াম দেখেছে। অথচ দেখবার কথা ছিল না। কথা ছিল কোনো এক একজিবিশনে যাবার। বৃষ্টি হচ্ছে দেখে বাবা ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন প্ল্যানে-টারিয়ামে। ওর মনে-মনে ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাবাকে বলেনি। দারুণ লাগল দেখতে। এক টিন ভর্তি চকোলেট পেয়েছে। করুণাকর-জেঠু হঠাৎ বিলেত চলে গেলেন পড়াতে। যাবার আগে দিয়ে গেলেন। একটা জাপানি পুতুল পেয়েছে। বাবার সেই জাপানি বন্ধু পাঠিয়েছেন। এছাড়া ছোটখাট কত কী যে হচ্ছে তার সব হিসাব টুংকা রেখে উঠতে পারছে না। এই তো সেদিন ওদের মনে হচ্ছিল, রোজ-রোজ এতক্ষণ ধরে স্কুল হওয়ার কোনো মানে হয় না। ওদের স্কুলের আবার ছুটিছাটা খুব কম। যদি ধরো

স্মরণীয় পুরস্কারের সম্ভার

প্রথম পুরস্কার বিজয়ী টিকিটের ওপর দুটি অতিরিক্ত
অভিনব বাম্পার প্রাইজ

এজেন্টদের প্রাইজ
৭০,০০০ টাকা

বিক্রেতাদের প্রাইজ
৩০,০০০ টাকা

জেতার জন্য কিনুন — জেতার জন্য বিক্রয় করুন

চণ্ডীগড় লটারীজ
(ইউনিয়ন টেরিটোরি চণ্ডীগড় রেড ক্রশ)

মোট পুরস্কার
২৬০৮০০ টাকা

দুটি মিনি 'ড্র' ও একটি মেইন ড্র সহ লটারী স্কীমের
বিশদ বিবরণের জন্য লিখুন—

অর্গানাইজিং সেক্রেটারী, চণ্ডীগড় লটারী
চণ্ডীগড় রেড ক্রস
সেক্টার ১৫ ডী, চণ্ডীগড়

অর্গানাইজার, মেসার্স কে. অ্যাণ্ড কোং
বাবা খড়্গ সিং মার্গ, নিউ দিল্লী ৪৭ মোহন সিং প্লেস
ফোন : ৩২০১১৩, ৩২০৭৪৬

Jupiter/B

একটা কোনো পরীক্ষার জন্য ছুটি দিতে হল, তাহলেই শনিবারের ছুটি কাটা যাবে। সকাল-বেলা উঠে পড়া করো, স্কুলে যাও, ফিরে এসে অল্প, খুবই অল্প খেলা করে আবার হোম টাস্ক করো। এই হোম টাস্কের ব্যাপারে নীলপরী একদম ফেল। হোমটাস্ক ওকে নিজেকেই করতে হচ্ছে। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, এইভাবে কি জীবন চালানো যায়? টুংকা সেদিন তাই বলল যে, স্কুলটা কিছুদিন ছুটি থাকলে বেশ হত। আর সত্যি-সত্যি সেদিনই নমিতাদি ক্লাসে ক্লাসে নোটিস শুনিয়ে গেলেন যে, কী একটা কারণে স্কুল শুক্রবার আর সোমবার বন্ধ থাকবে। পর-পর চারদিন ছুটি। সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী ঘোষণা : অতঃপর দুই শনিবার স্কুল হবে। নীলপরীর দৌলতে বাবা টুংকাকে সাঁতার শেখার অনুমতি দিলেন।

টুংকার বাবার সব ভাল, শুধু অযথা ভাবনা-চিন্তা করেন। দাদা কলেজ থেকে ফিরতে দেরি করলে গিয়ে রাস্তায় পায়চারি করেন। টুংকাকে কখনো স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে পিকনিক করতে যেতে দেন না। বাবার সব সময় ভয়, কিছু একটা খারাপ হয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে, জলে ডুবে যাবে, আগুনে হাত পোড়াবে, কিংবা আছাড় খেয়ে ঠ্যাং ভাঙবে। অথচ মজা এই যে, বাবাই দু-দুবার পা মচকেছেন। সেই বাবা যে এক কথায় টুংকাকে সাঁতার শেখাতে ভর্তি করালেন, তার একমাত্র কারণ, টুংকার মতে, নীলপরী। দাদা অনেক চেষ্টা করেও সাইকেল করে বাড়ি থেকে কলেজ যাবার অনুমতি পায়নি। টুংকার দিনকাল তাই ভাল যাচ্ছে।

কিন্তু বেশি দিন চলল না। পরে অনেক ভেবে দেখেছে, ওর বর শেষ হয়ে গেল ওই দাদারই জন্য। দাদা একদিন কলেজ থেকে এল জ্বর নিয়ে। ঠিক জ্বর নিয়ে আসেনি, এসে বলল, "আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।" শুয়ে পড়ল। মা বললেন, "একটু থার্মোমিটার দিয়ে দ্যাখ্ জ্বর এল কি না।" দাদা বলল, "না না, সেরকম নয়।" কিন্তু মা জোর করে থার্মোমিটার দিলেন। জ্বর একশো দুই। তারপর বাড়িতে তুলকালাম কাণ্ড। দাদার জ্বর বাড়তেই লাগল। বাবা এমনিতেই ভিতু মানুষ। তারপর যখন দাদার কাঁপুনি ধরতে লাগল, তখন বাবা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। ডাক্তারবাবু এলেন, দেখলেন, ওষুধ দিলেন। বাবা আইসব্যাগ তৈরি করে মাথায় দিতে লাগলেন। মাথা ধোয়ানো হতে লাগল। দাদা কথাবার্তা না বলে চোখ বুজে শুয়ে রইল। টুংকার সঙ্গে দাদা সব সময় খুনসুটি করে। টুংকা যতক্ষণ না রেগে যাচ্ছে, ততক্ষণ থামবে না। এখন কিন্তু টুংকার এমনি-এমনি চোখে জল এসে যেতে লাগল। দাদাটাকে যে ও এত ভালবাসে, সে-কথা ওর আগে জানা ছিল না। ও গিয়ে দাদার পাশটিতে বসল। দাদার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। ওর হাতের ছোঁয়া পেয়ে দাদা চোখ খুলল। বলল, "খেঁদু-রানী, তুই অত কাছে আসিস না, ছোঁয়াচে রোগ হলে তোরও হবে।" টুংকার আরও জোরে চোখে জল এসে গেল। 'খেঁদুরানী' বলাতে একটুও রাগ হল না। ও ঘরের কোণে গিয়ে মনে-মনে বলল, "নীলপরী, তুমি আমার দাদাকে ভাল করে দাও শিগগির, আমি ক্লাসে ফার্স্ট হবার বর চাইব না। শুধু তাই নয়, আমি আর কোনো বরই চাইব না। শুধু আমার দাদাভাইকে তুমি ভাল করে দাও। শিগগির ভাল করে দাও।"

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, "বড্ড পাজি ভাইরাস। ছেলেটাকে ভোগাবে।" রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দিলেন। পরের দিন বড় ডাক্তারও এসে-ছিলেন। ওঁদের কাউকে টুংকা নীলপরীর কথা বলেনি। কিন্তু নীলপরী ঠিকই কথা শুনে-ছিল। তিনদিনের দিন সকালবেলা দাদার টেম্পারেচার সাতানব্বুই। বাবা খুশি হয়ে গেলেন ভীষণ। মা তো আর বাবার মতো অত হৈচৈ করে অস্থির হন না, তবু মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, তাঁর একটা মস্ত উদ্বেগ কেটেছে। সবাই খুশি। দাদাভাই জ্বর ছেড়ে যাবামাত্র আব্দার ধরল, ও কলেজে যাবে। বাবা বললেন, "ছেলেমি কোরো না।" দাদাভাই গোঁজ হয়ে রইল। টুংকা গিয়ে বলল, "কলেজে গিয়ে পড়িস্ তো খুব, আসলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া হচ্ছে না বলে বাবুর কষ্ট হচ্ছে।" দাদা আচ্ছা করে চুল ধরে টেনে দিল। টুংকার একটুও রাগ হল না।

কেউ কিন্তু জানতেই পারল না যে, দাদার জ্বর ছেড়ে গেল নীলপরীর জন্য। টুংকা স্বাতীকে হারিয়ে এবার প্রথম হবে ঠিক করে-ছিল। সে কাজটা নীলপরীর সাহায্য ছাড়াই করতে হবে।

ছবি অলোক ধর

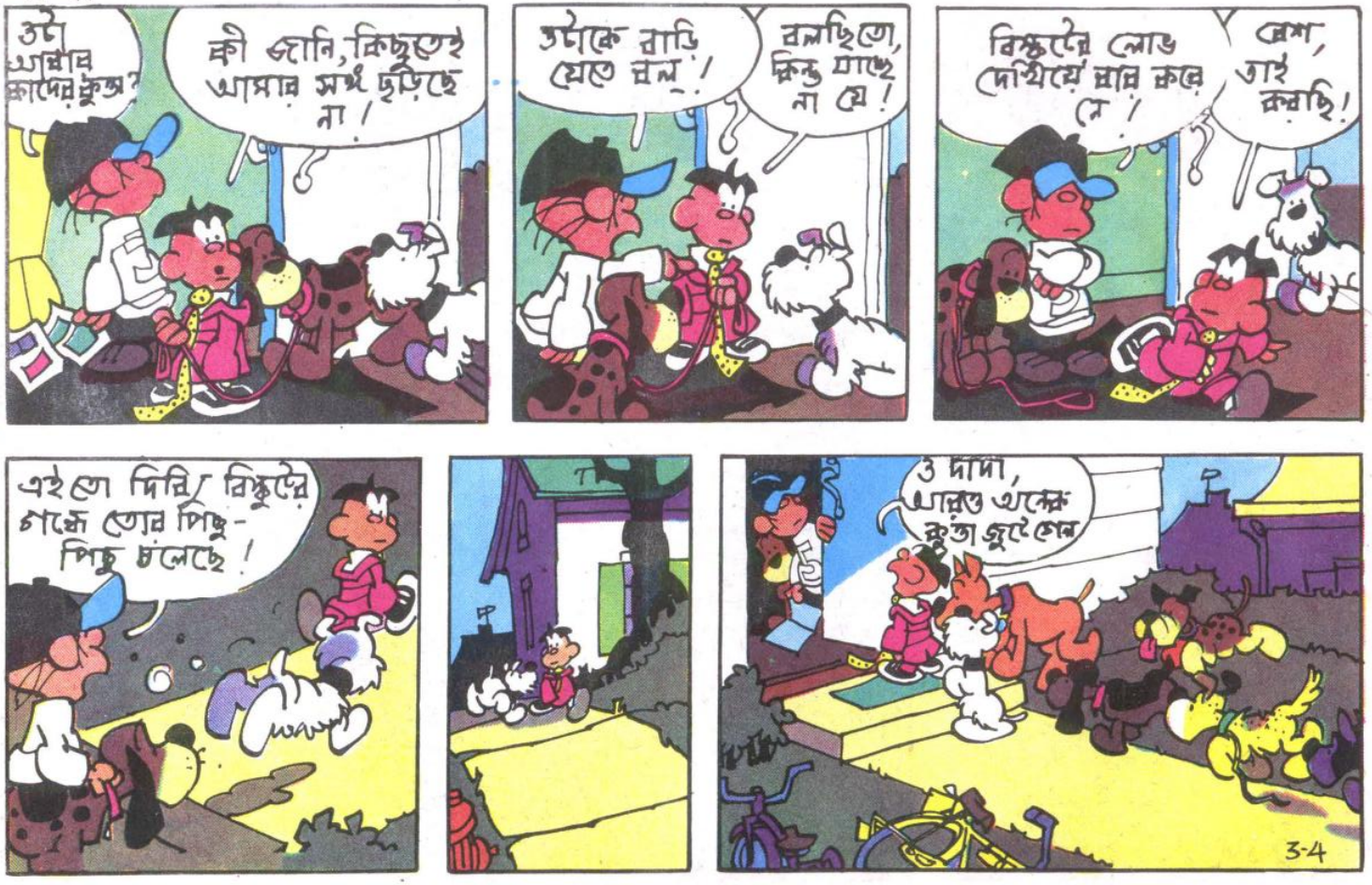

বাঘা ২

ওটা আবার কাদের কুত্তা?
কী জানি, কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ছে না!
ওটাকে বাড়ি যেতে বল্!
বলছি তো, কিন্তু যাচ্ছে না যে!
বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে দূর করে দে!
বেশ, তাই করছি!
এই তো দিব্যি বিস্কুটের গন্ধে তোর পিছু-পিছু চলেছে!
ও দাদা, আরও অনেক কুত্তা জুটে গেল
3-4

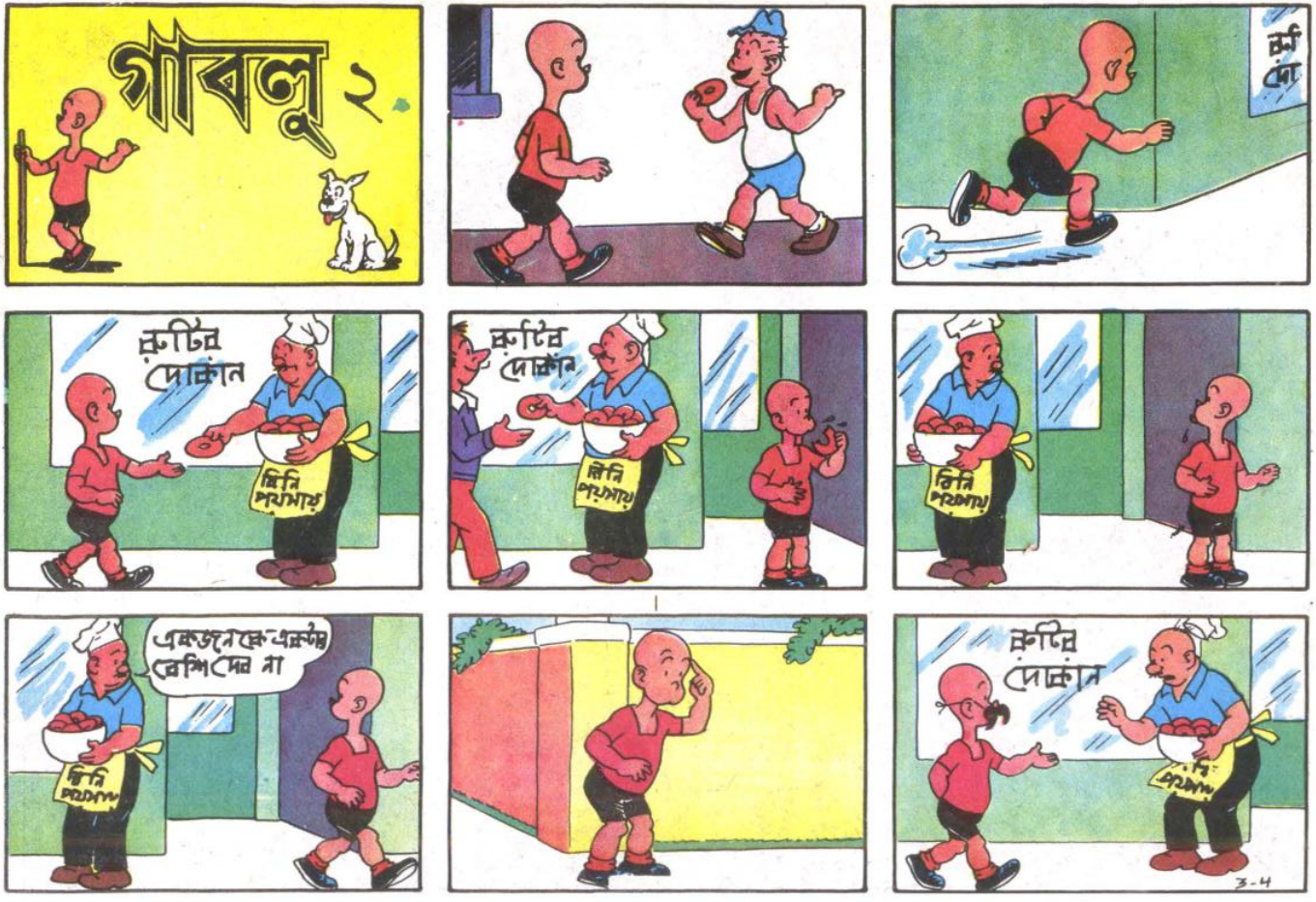

গাবলু ২
রুটির দোকান
বিনি পয়সায়
রুটির দোকান
বিনি পয়সায়
বিনি পয়সায়
একজনকে একটার বেশি দেব না
বিনি পয়সায়
রুটির দোকান

মাধ্যমিকে ফার্স্ট অভির কথা

ছেলেটির পরনে ফুলহাতা শার্ট আর ট্রাউজারস্। পায়ে ফুল মোজা। দু' হাতে, মুখে মশা-তাড়ানো ক্রীম মেখেছে। তার একটা অস্বস্তিকর চটচটে ভাব। আর একটা অদ্ভুত গন্ধ। কিন্তু ক্রীম না মাখলেই নয়, যে রাক্ষুসে মশা ওদের এলাকার। ফাইনাল পরীক্ষার পড়া তৈরি করেছে ছেলেটি। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ নেমে এল সর্বগ্রাসী অন্ধকার। সত্তরের দশকের পশ্চিমবাংলার অন্যতম অভিশাপ লোডশেডিং।

এ-পর্যন্ত বেশ মিলে যায়। এই ছবি দেখা গেছে রাজ্যের ঘরে-ঘরে। কিন্তু যদি বলা হয় যে, এই ছেলেটিই অভিজিৎ চৌধুরী, যে হিন্দু স্কুল থেকে ১৯৭৯-র মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে, তাহলে কাহিনীর বাকিটা শোনার জন্যে কার না আগ্রহ হয়? ঠিক এই আগ্রহ নিয়েই গিয়েছিলাম সেদিন লবণহ্রদ উপনগরীর এক নম্বর সেক্টরের 'সিডি' ব্লকের ১২৯ নম্বরের বাড়ি 'প্রচেতা'-য়। একটু আগে এক পশলা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে রোদ উঠেছে, চারদিক হাসছে। অভিজিৎও এক-মুখ হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা করল আমাকে। মা আগেই 'অভি'কে বলে দিয়েছেন আনন্দমেলার প্রতিনিধি আসার কথা। সোফায় বসতে বসতেই অভিজিৎ জানাল, একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই ও আনন্দমেলার গ্রাহক এবং ভক্ত পাঠক। আনন্দমেলা পাক্ষিক হওয়াতে ও খুব খুশি, তবে আগের মতো বড় আকার বজায় রেখে পাক্ষিক হলে আরও খুশি হত। জিজ্ঞেস করল, পুজো-সংখ্যাটা অন্যান্য বছরের মতো সুন্দর হবে তো? ও জানাল, লেখাপড়া-বিভাগের সঙ্গে ওর সুদীর্ঘ পরিচয়ের কথা। আর পুজো সংখ্যা আনন্দমেলার "হেড- এগজামিনারের উপদেশ ও পরামর্শ" অংশটি ওকে কীভাবে কাজ দিয়েছে। বিশেষ করে বলল গত পুজো-সংখ্যার "কীভাবে উত্তর লিখতে হয়" অংশটির কথা। যা ওকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঠিকভাবে উত্তর লিখতে দারুণ সাহায্য করেছে।

অভিজিতের বাড়ির লোকদের কথা আর ওর পড়াশোনা সম্পর্কে কিছু বলার আগে কৌতূহলী পাঠকপাঠিকাদের জানিয়ে দিই ও কোন্ সাবজেক্টে কত নম্বর পেয়েছে। বাংলায় ১৫৬ (১২৩+৩৩), ইংরেজিতে ৭০, সংস্কৃতে ৭৮। অঙ্কে ৯৯, ফিজিক্যাল সায়েন্সে ৯৬ (৭৭+১৯), লাইফ সায়েন্সে ৮৯ (৬৯+২০)। অতিরিক্ত অঙ্কে ৬১ (৯৫–৩৪) যোগ করেছে। ইতিহাসে পেয়েছে ৮৪ (৭৪+১০) আর ভূগোলে ৮১ (৭১+১০) কর্মশিক্ষা-ইত্যাদি বিষয়টিতে ৮০। মোট ৮৯৪। পর্যতের মার্ক-শীটে যেমন মৌখিকের নম্বর আলাদা করে দেখানো আছে, ব্র্যাকেটে সেইরকমই লিখলাম।

আনন্দমেলার প্রতিনিধি হয়ে যতই কৃতী ছেলেমেয়েদের জেনেছি, ততই একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে আমার মনে—পারিবারিক পরিবেশকে ভাল ফল করার অনুকূল হতেই হবে। দেবাশিস বসু, সোমা রায়চৌধুরী, গৌতম মণ্ডল, সোমক রায়চৌধুরী—এই সব ছেলেমেয়েদের মতো অভিজিতের বাড়ির পরিবেশটাও ষোল আনা লেখাপড়ার। এবং আমার তো মনে হয় ওর ভাল ফলের অর্ধেক রহস্য এখানেই। অভিজিতের পিতামহ চারুচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের ফিজিক্সের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও পরে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের উপাধ্যক্ষ। ওঁর লেখা বহু ফিজিক্স-বই ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে। বাবা শ্রীসুব্রত চৌধুরীও উচ্চশিক্ষিত, বর্তমানে ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানির সেলস ডিভিসনের অন্যতম সিনিয়র ম্যানেজার, আর মা শ্রীমতী শিপ্রা চৌধুরী ইতিহাসের এম. এ। ওঁরা আগে শ্রীহট্টে থাকতেন। বাবার এক কাকা হচ্ছেন ডঃ কিরণ চৌধুরী, যিনি ইতিহাসের বই অনেক লিখেছেন এবং বর্তমানে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ। অভিজিতের দাদা সুরজিৎ মাধ্যমিকে (১৯৭৬) ষষ্ঠ হয়েছিল হিন্দু স্কুল থেকেই আর গতবার উচ্চ মাধ্যমিকে অষ্টম হয়েছে, এখন খড়্গপুর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং নিয়ে পড়ছে।

আর স্কুলের শিক্ষকরা তো ছিলেনই।

হ্যাঁ, কী কী বই পড়েছে অভিজিৎ তা-ও জেনে নিয়েছি। ইংরেজিতে পি কে দে সরকার.

মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফার্স্ট অভিজিৎ চৌধুরীর দুটি নমুনা-উত্তর আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

রেন অ্যান্ড মার্টিন। এ-ছাড়া রচনা ও অনুচ্ছেদ লেখার জন্য ম্যাকমিলান কোম্পানির প্রকাশিত 'টু হানড্রেড এসেজ' বইটি। বাংলা রচনা নিজে লিখলেও মাঝে-মাঝে যে-বইটির সাহায্য নিয়েছে তা হল বিভূতি চৌধুরীর রচনা-বিচিত্রা। এ-ছাড়া হেরম্ব চক্রবর্তীর পুরনো হায়ার সেকেন্ডারি সিলেবাসের বই, আর ডঃ সুকুমার সেনের একটি বই। সংস্কৃতে সেই আদি এবং অকৃত্রিম 'হেল্পস্ টু দা স্টাডি'। আর হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্যাকরণ-কৌমুদী। ভূগোলে লাহিড়ী-সেন-গুপ্ত, ডঃ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্থনৈতিক ভূগোলের একটি বই দত্ত-গুহ-ভট্টাচার্য। ইতিহাসে 'দাদুর' (ডঃ কিরণ চৌধুরীর) বই, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নিমাইসাধন বসু, ডঃ অতুল রায় আর কল্যাণ চৌধুরী। অঙ্কে কেশবচন্দ্র নাগ, হল অ্যান্ড স্টিভেন্স, হল অ্যান্ড নাইট, গাঙ্গুলি-মুখার্জি, দাশ-বর্মন, কেশবচন্দ্র নাগের আর দাশ-মুখার্জির পুরনো হায়ার সেকেন্ডারি সিলেবাসের বই। আর এ আই এম টি-র অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েশন ফর ইমপ্রুভমেন্ট অব ম্যাথামেটিকস টীচিং-এর বইগুলি। বিজ্ঞানে, ফিজিক্সে 'দাদু'র (অধ্যাপক চারুচন্দ্র চৌধুরীর) বইগুলি, বিশেষত পুরনো হায়ার সেকেন্ডারির উচ্চতর বিজ্ঞানের কথা (নবপর্যায়) আর 'ফিজিক্স ফর দা বিগিনার্স' বই দু'টি, দে অ্যান্ড ত্রিপাঠী, রবি রায় আর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রকাশিত বইটি। কেমিস্ট্রিতে অধ্যাপক পি কে দত্তর ইন্টারমিডিয়েট কেমিস্ট্রি আর 'ল্যাডলি'। বিজ্ঞানে আর যে-সব বই থেকে অভিজিৎ খুব সাহায্য নিয়েছে তা হল মাধ্যমিক স্তরের জন্য এন-সি-ই-আর-টি (ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড টীচিং) প্রকাশিত প্রত্যেকটি বিজ্ঞান বই এবং ই এল বি এস-এর 'এ ডিক্সনারি অব সায়েন্স'। বিশেষত শেষের বইটিতে সংজ্ঞাগুলো নির্ভুল। লাইফ সায়েন্সে অভিজিৎ যে বইগুলি ভাল করে পড়েছে তা হল তারকমোহন দাশ, কুন্ডু-দাশ-কুন্ডু, ডাঃ অমূল ভূষণ চক্রবর্তী আর কুন্ডু-চ্যাটার্জির পুরনো সিলেবাসের বই। আর, সব বিষয়েই টেক্সট পেপার্স এবং পর্ষৎ-বার্তা।

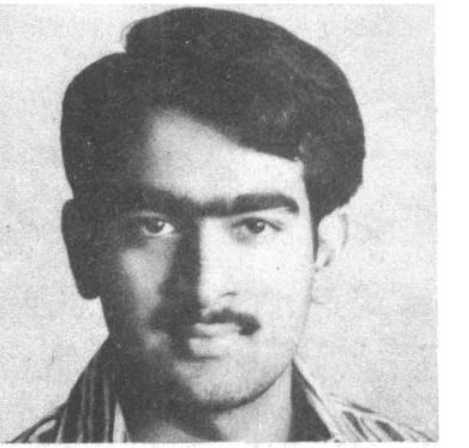

এবার দেখা যাক, অভিজিৎ পড়াশোনা করেছে কীরকম করে। প্রথমে ও টেক্সট এবং নির্বাচিত রেফারেন্স বইগুলি ভাল করে পড়ে নেয়। তারপর যে টপিক্‌গুলো, কোনও একটা বইতে ভালভাবে পাওয়া যায় না, সেগুলো ও বিভিন্ন বই মিলিয়ে তৈরি করে নেয়। তা ছাড়া অনেক বইতে অনেক জিনিস পূর্ণাঙ্গভাবে দেওয়া থাকে না, সেগুলো লিখে তৈরি করতে হয়।

অভিজিতের জন্ম ১৯৬২-র ৪ নভেম্বর। স্বাস্থ্যটা বেশ ভাল, তাই বয়সের অনুপাতে একটু বড়ই দেখায়, তার উপর শখ করে দাড়ি রাখছে। কেজি 'টু' পর্যন্ত হোলি চাইল্ডস ইনস্টিটিউটে পড়েছে, ওয়ান থেকেই হিন্দুতে। স্কুলে সব সময়ই যে ফার্স্ট হয়েছে তা নয়, দেবাংশু মজুমদার (যে এবার মাধ্যমিকে সেকেন্ড হয়েছে) ওকে কয়েকবারই হারিয়ে দিয়েছে।

স্কুলের পড়ার গন্ডির বাইরেও অভিজিৎ তার দক্ষতার পরিচয় রেখেছে। নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম পরিচালিত ভারত পরিচয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে গত বছর, আর তার আগের বছর কলকাতার রোটারি ক্লাব আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। এ আই এম টি পরিচালিত ম্যাথামেটিক্স কুইজ প্রতিযোগিতা জিতেছে ১৯৭৬ সালে।

বাঘিদাশ

একটা ছেলে ছিল। তার বাবা কাঠ কাটত। যখন কাঠ কাটা হয়ে যেত তখন সে ঘরে ফিরে যেত। একদিন সে কাঠ কেটে ঘরে ফিরে যাওয়ার পথে একটা বাঘ দেখে মেরে ফেলল। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল বাঘিদাশ।

রোশ্‌নাই চট্টোপাধ্যায় (বয়স ৬)

বাবার বুদ্ধি

একদিন আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল। আমরা তখন সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ বাবার ঘুম ভেঙে গেল। বাবা আমাকে বললেন, "বন্দুকটা দে তো! কে যেন এসেছে।"

তাই শুনে ভয় পেয়ে চোরটা সব ফেলে পালিয়ে গেল। বাবার কী বুদ্ধি! আমাদের বাড়িতে বন্দুকই নেই।

আশিস মিত্র (বয়স ৬)

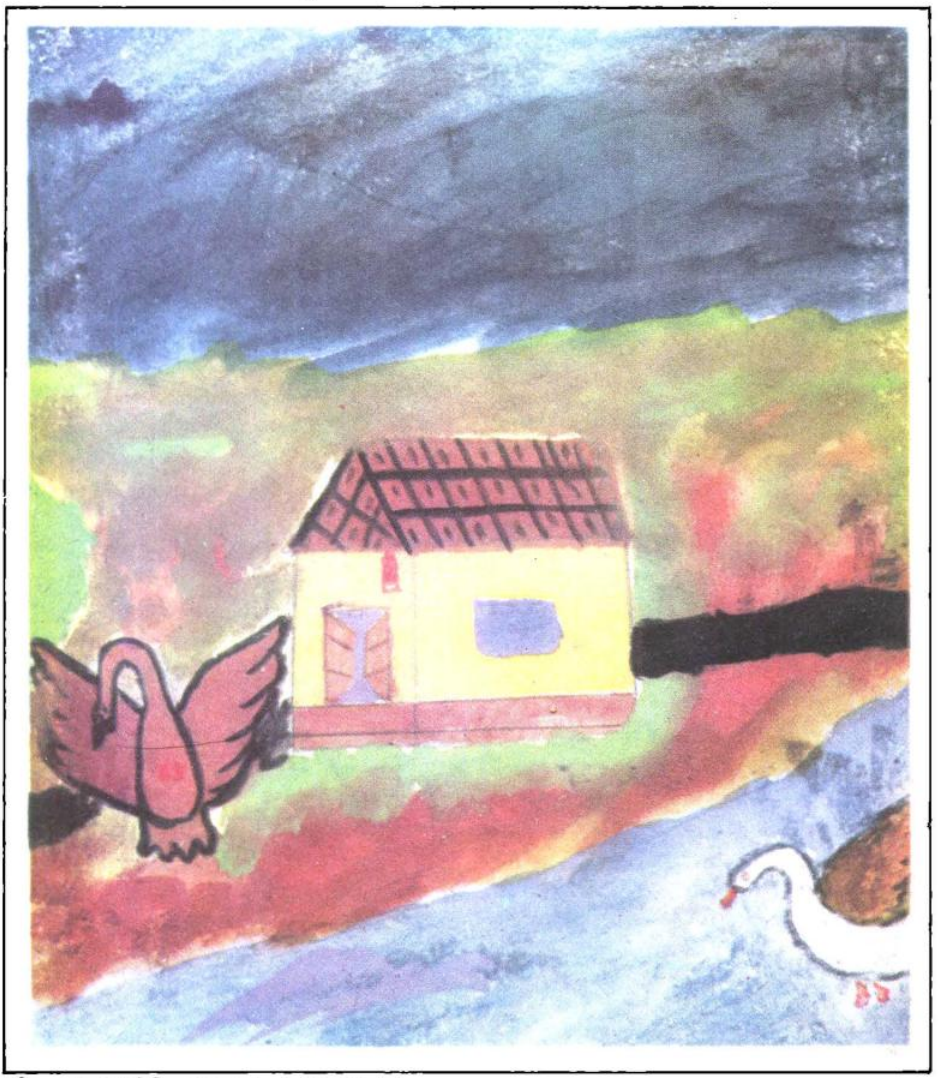

ছবি এঁকেছে **উদিতকুমার বসু** (বয়স ১১)

ছবি এঁকেছে **তন্ময় সামন্ত** (বয়স ৬)

টুটুলের দুষ্টুমি

আমাদের বাড়ির পাশে একটা হলুদ রঙের ছোট্ট বাড়ি আছে। সেই বাড়িতেই থাকে টুটুল ব'লে একটা ছোট মেয়ে। টুটুল দেখতে ভারী মিষ্টি, মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুল, গায়ের রঙ ফর্সা আর তার চোখ দুটো গোল গোল। ও কিন্তু ভারী দুষ্টু। দুষ্টুমি বুদ্ধি ওর মাথায় সব সময় ঘোরে। এই তো সেদিন টুটুলের দিদা এসেছিলেন, ওর মা, বাবা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। দুপুরবেলা তাই টুটুলের দিদা কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তার মধ্যেই টুটুল একটা কান্ড করে বসল।

ছবি আঁকার রঙ দিয়ে দিদার মুখে রঙ করে দিয়েছে ও। দিদার যেই ঘুম ভেঙেছে অমনি টুটুল তাদের বড় আয়নাটার পিছনে লুকিয়ে পড়ল। দিদা নিজের মুখ হাত দিয়ে দেখলেন, তাঁর মুখে রঙ! তাই তিনি বাথরুমে মুখ ধুতে গেলেন। চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে মুখে দিতেই একটা এনজেল মাছ লাফিয়ে পড়ল। টুটুল কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। পালিয়ে গেল। কারণ এবার সে দুটো অন্যায়ের জন্যে বকুনি খাবে। আসলে, টুটুল করেছিল কি, অ্যাকোরিয়ামের মাছগুলো চুপি চুপি চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিয়েছিল।

বন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১২)

বড় খেলা

রেফারী মাঠে এল
বাঁশিতে ফুঁ দিল
খেলা শুরু হল
মিহিরকে পাশ দিল
মিহির জোরে ঠেলল
সুরজিৎ ধরল
পেয়েই সোজা ছুটল
পেনাল্টি বক্সে পৌঁছল
টেনে গোলে মারল
শিবাজী লাফ দিল
মুখ থুবড়ে পড়ল
বল গোলে ঢুকল
চিৎকার উঠল
অনেক বোমা ফাটল
কাঁসর-ঘণ্টা বাজল
বেলুন কত উড়ল
সমর্থকরা নাচল
ইলিশের দর বাড়ল
চিংড়ির দর কমল

সুপ্রতিম সরকার (বয়স ৭)

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও চালাঘর

এবার নমুনায় দেখো আরও কয়েক রকমের গ্রামের চালাঘর। একচালা, দোচালা, আর চার-চালার যেমন ছাদ হয় তেমন এক-তলা দোতলা বাড়িও হয়। ওপরের নমুনার দিকে ভাল ভাবে নজর দিলে এবার আর গ্রামের বাড়ি আঁকতে ভুল হবে না। নমুনার বাড়িগুলো পর পর কয়েকটা বসালেই গ্রাম। তোমরা গ্রামের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তার ঘর-বাড়ি আর মানুষদের বিশেষত্বের দিকে নজর দিতে ভুলে যেও না। নমুনার থেকেও বড় জানা হবে গ্রামে গিয়ে এসব দেখতে পারলে।

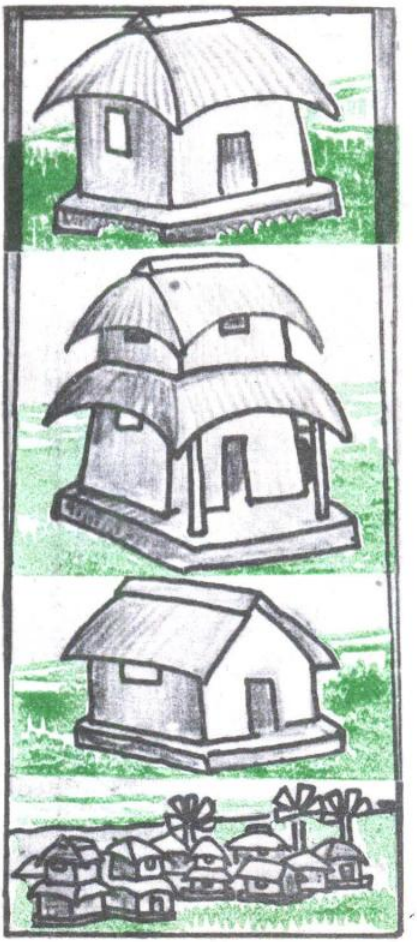

কারিগর

বাঁশের কাজ : ফুলের সাজি

জোগাড় করা জিনিস দিয়ে আরম্ভ করো। যে মাপের সাজি করবে সেই অনুযায়ী বেশ সরু কাঠি তৈরি করে রাখো। সাজির মুখের আর নীচের গোলের জন্যে বাঁশের পাতলা বাতা দিয়ে গোল করে বেঁধে নিয়ে কেটে রাখা কাঠিগুলো দূরত্ব মাফিক সুতো দিয়ে বেঁধে নাও (১নং ছবি)। বাঁধা হলে তলার ফাঁকা গোলটা বুনে ফেলো কাঠি দিয়ে (৩নং ছবি)। বোনার ধরন হবে ২ নং ছবির মতো। এবার ওপরের গোল তৈরি করে নীচের মতোই বেঁধে ফেলে সাজির দু পাশ দিয়ে হাতলের জন্য একটু মোটা বাঁশের বাতা ঘুরিয়ে বেঁধে সাজির কাজ শেষ করো।

জেনে রাখো (১) পর পর কাঠি বাঁধার ফাঁকগুলো সমান রাখবে। (২) মুখ আর হাতল সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে ঢেকে দিলে হাতে লাগবে না। (৩) হাতলের আড়াআড়ি চেপে দাঁড় বাঁধলে আকার পালটাবে। (৪) নীচের গোলে কাঠি বাঁধার সময় তলার দিকে একটু বেশি রাখলে সাজি রাখতে সুবিধে আর বাঁধনের দাঁড় কাটবার ভয় থাকবে না।

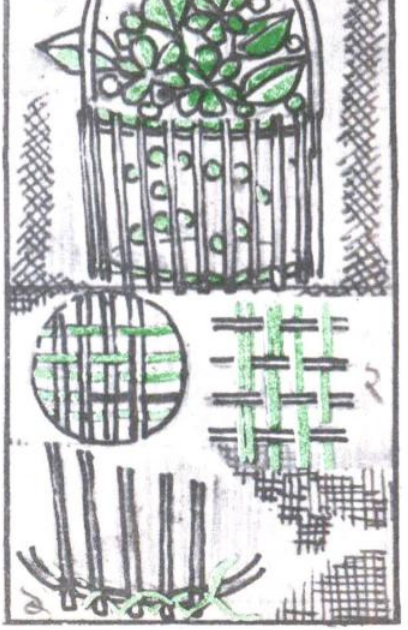

ইংরেজ শাসকদের নিজস্ব বলতে যা কিছু ছিল তার মধ্যে ফুটবল অন্যতম। ইংরেজ রাজত্ব চলে গিয়েছে-কিন্তু ফুটবল আজও আছে।

ভারতে ফুটবল খেলার বয়স এখন একশ বছর পেরিয়ে গেছে। এর শুরু কলকাতাতেই। মায়ের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে এসেছিল ছোট্ট নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। কেল্লার মাঠে গোরা সৈন্যদের চামড়ার বল নিয়ে ছোটাছুটি করতে দেখে তার মাথাতেও ঝোঁক চাপল ফুটবল খেলার। পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে খেলা শুরু হল। সেই হল কলকাতায় দেশীয়দের ফুটবল খেলার গোড়াপত্তন।

১৯১১ সাল। কলকাতা তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। তাই কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল দিল্লিতে। আর এই ১৯১১ সালেই একদিন দুর্দ্ধর্ষ গোরাদলকে হারিয়ে দেশীয় দলের শীল্ড বিজয়ের জয়ধ্বনি উঠল আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে। সেদিন সারা কলকাতা সারারাত ধরে করেছিল উল্লাস। শুধু চুপ ছিল সাহেবদের পাড়া।

এই সেই কলকাতা। ১৯১১ সালেই নয়, তার আগে এবং তার পরেও অনেক ইতিহাস রচনা করে চলেছে। করছে এখনও। কলকাতাতেই ভারতের প্রথম ভূগর্ভ রেল পাতা হচ্ছে। যেদিন চালু হবে সেদিন দমদম কি টালিগঞ্জ, যেদিক থেকেই আসুন না কেন, ময়দানের ফুটবলের আসরে স্বচ্ছন্দে পৌঁছে যাবেন পনের মিনিটেই।

medium

ফুটবল বলতেই কলকাতা
ভূগর্ভ রেল বলতেও কলকাতা

মেট্রো রেলওয়ে,
কলকাতা

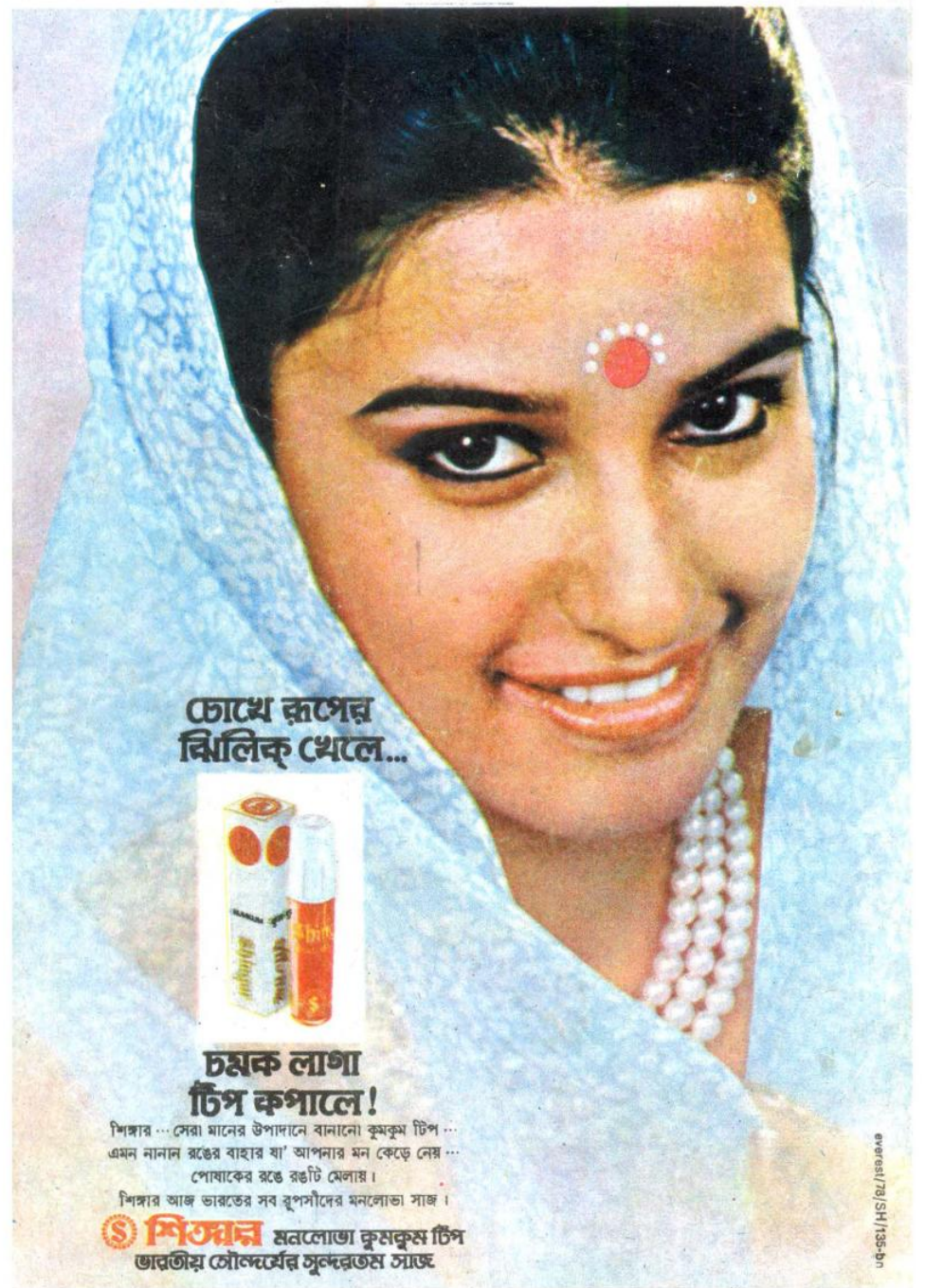
চোখে রূপের
ঝিলিক্ খেলে...
চমক লাগা
টিপ কপালে!
শিঙ্গার ···সেরা মানের উপাদানে বানানো কুমকুম টিপ ···
এমন নানান রঙের বাহার যা' আপনার মন কেড়ে নেয় ···
পোষাকের রঙে রঙটি মেলায়।
শিঙ্গার আজ ভারতের সব রূপসীদের মনলোভা সাজ।
শিঙ্গার মনলোভা কুমকুম টিপ
ভারতীয় সৌন্দর্যের সুন্দরতম সাজ
everest/78/SH/136-bn